সুজন হরবোলা

সত্যজিৎ রায়

সূচী

সুজন হরবোলা ৯
গঙ্গারামের কপাল ২৯
রতন আর লক্ষ্মী ৪২
কানাইয়ের কথা ৫৯

সুজন হরবোলা

॥ ১ ॥

সুজনের বাড়ির পিছনেই ছিল একটা সজনে গাছ। তাতে থাকত একটা দোয়েল। সুজনের যখন আট বছর বয়স তখন একদিন দোয়েলের ডাক শুনে সে ভাবল—আহা, এ পাখির ডাক কেমন মিষ্টি। মানুষে কি কখনো এমন ডাক ডাকতে পারে ? সুজন সেইদিন থেকে মুখ দিয়ে দোয়েলের ডাক ডাকার চেষ্টা করতে লাগল। একদিন হঠাৎ সে দেখল যে সে ডাক দেবার পরেই দোয়েলটা যেন তার ডাকের উত্তরে ডেকে উঠল। তখন সে বুঝল যে এই একটা পাখির ডাক তার শেখা হয়ে গেছে। তার মা দয়াময়ীও শুনে বললেন, 'বারে খোকা, মানুষের গলায় এমন পাখির ডাক ত শুনিনি কখনো !' সুজন তাতে যারপরনাই খুশি হল।

সুজন দিবাকর মুদির ছেলে। তার একটা বড় বোন ছিল, তার বিয়ে হয়ে গেছে, আর একটা বড় ভাই মারা গেছে তিন বছর বয়সে। সুজন তাকে দেখেইনি। সুজনের মা খুব সুন্দরী, সুজন তার মতো নাক-চোখ পেয়েছে, তার রঙটাও বেশ পরিষ্কার।

দিবাকরের ইচ্ছা ছেলে লেখাপড়া শেখে, তাই সে সুজনকে হারাণ পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করে দিল। কিন্তু পড়াশুনায় সুজনের একেবারেই মন নেই। পাততাড়ি নিয়ে পাঠশালায় বসে থাকে আর এ গাছ সে গাছ থেকে পাখির ডাক শুনে মনে মনে ভাবে এসব ডাক সে গলায় তুলবে। গুরুমশাই পাঁচের নামতা বলতে বললে সুজন বলে, 'পাঁচেক্কে পাঁচ, পাঁচ দুগুণে বারো, তিন পাঁচে আঠারো…'। গুরুমশাই তাকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে দেন, সেই অবস্থায় সুজন শালিক বুলবুলি চোখ-গেল পানকৌড়ির ডাক শোনে আর

ভাবে কখন সে পাঠশালা থেকে ছুটি পেয়ে এই সব পাখির ডাক নকল করতে পারবে।

তিন বছর পাঠশালায় পড়েও যখন কিছু হল না তখন একদিন হারাণ পণ্ডিত দিবাকরের দোকানে গিয়ে তাকে বলল, 'তোমার ছেলের ঘটে বিদ্যা প্রবেশ করানো শিবের অসাধ্য। আমি বলি কি তুমি ছেলেকে ছাড়িয়ে নাও। তোমার কপাল মন্দ, নইলে তোমার এমন ছেলে হবে কেন? অনেক ছেলেই ত দিব্যি লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে যাচ্ছে।'

দিবাকর আর কী করে, ছেলেকে ডেকে জিগ্যেস করল, 'অ্যাদ্দিন পাঠশালায় গিয়ে কী শিখলি?'

'আমি বাইশ রকম পাখির ডাক শিখেছি, বাবা', বলল সুজন। 'আমাদের পাঠশালার পিছনে একটা বটগাছ আছে, তাতে অনেক রকম পাখি এসে বসে।'

'তা তুই কি হরবোলা হবি নাকি?' জিগ্যেস করল দিবাকর।

'হরবোলা? সে আবার কি?'

'হরবোলারা নানারকম পাখি আর জন্তু-জানোয়ারের ডাক মুখ দিয়ে করতে পারে। তারা এইসব ডাক ডেকে লোককে শুনিয়েই রোজগার করে। তোর যখন পড়াশুনা হল না, তখন দোকানে বসেও তুই কিছু করতে পারবি না। হিসেব যে করবি, সে বিদ্যেও ত তোর নেই। তাই তোকে আমার কোনো কাজে লাগবে না।'

সুজন সেই থেকে হরবোলা হবার চেষ্টায় লেগে গেল। তার কাজ মাঠে ঘাটে বনবাদাড়ে ঘোরা, আর পাখির ডাক শুনে, জানোয়ারের ডাক শুনে, সেই ডাক মুখ দিয়ে নকল করা। এই কাজে তার ক্লান্তি নেই, কারণ তার স্বাস্থ্য বেশ ভালো, অনেক হাঁটতে পারে, গাছে চড়তে পারে, সাঁতার কাটতে পারে। তার ডাকে যখন পাখি উত্তর দেয়, তখন তার মনটা নেচে ওঠে। মনে হয় সব পাখিই তার বন্ধু। খোলা মাঠে গিয়ে বসে গরু বাছুর ছাগল ভেড়ার ডাক সে তুলেছে, তারা তার ডাকে জবাব দেয়। তার হাম্বা ডাক শুনে নিস্তারিণী বুড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ধবলীর বাছুরটা হঠাৎ ফিরে এল ভেবে; তার গাধার ডাক শুনে মোতি ধোপার গাধা ঘাড় তুলে কান খাড়া করে ডাকতে শুরু করে, মোতি ভাবে আরেকটা গাধা এল কোত্থেকে। ঘোড়ার চিহিতেও সুজন ওস্তাদ,

সেটা সে ডাকে জমিদার হালদারের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে। সে ডাক শুনে সহিস করিমমিঞা ভাবে, কই, আমার ঘোড়া ত ডাকছে না—এটা আবার কার ঘোড়া ?

আর পাখির কথাই যদি বল, তাহলে সুজন অন্তত একশো পাখির ডাক তুলেছে। কাক চিল চড়ুই শালিক কোয়েল দোয়েল পায়রা ঘুঘু তোতা ময়না বুলবুলি টুনটুনি চোখ-গেল কাদাখোঁচা কাঠঠোকরা হুতোম প্যাঁচা—আর কত নাম করব ? সুজন এইসব পাখির ডাক তুলে নিয়েছে এই গত কয়েক বছরে। সে ডাক শুনে পাখিরাই যদি ভুল করে তাহলে মানুষের আর কী দোষ ?

বয়স কত হল সুজনের ? তা হয়েছে মন্দ কী। তাকে আর খোকা বলা যায় না, সে এখন জোয়ান। সে গতরে বেড়েছে, সবল সুস্থ শরীর হয়েছে তার। বাবা বলে, তুই এবার কাজে লেগে পড়। রোজগারের বয়স হয়েছে তোর। কার্তিক হরবোলা থাকে এই পাশের গাঁয়ে। তাকে গিয়ে বল তোর একটা হিল্লে করে দিতে। না হয় তার সঙ্গে রইলি কটা দিন ; তারপর আরেকটু বয়স হলে নিজের পথ দেখবি।

বাপের কথা শুনে সুজন কার্তিক হরবোলার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। কার্তিকের বয়স হয়েছে দুকুড়ির উপরে—সে বিশ বছর হরবোলার কাজ করছে। কিন্তু সুজন দেখল সে নিজে যতরকম ডাক জানে, কার্তিক তার অর্ধেকও জানে না। সুজন এই কিছুদিন হল নাকী সুরে মুখ দিয়ে সানাই বাজাতে শিখেছে, তার সঙ্গে ডুগী তবলা সে নিজেই বাজায় ; শিঙে ফোঁকার আওয়াজও শিখেছে, নাচের সঙ্গে যে ঘুঙুর বাজে সেই ঘুঙুরের আওয়াজ করতে শিখেছে মুখ দিয়ে। কার্তিক এসব কিছুই জানে না। সে সুজনের কাণ্ড দেখে হাঁ। তবে মুখে কিছু বলল না, কারণ কার্তিকের হিংসে হচ্ছিল। সে শুধু বলল, 'আমি সাকরেদ নিই না। তোমার যা করার তা নিজেই করতে হবে।'

সুজন বলল, 'আজ্ঞে আপনি কি করে শুরু করলেন তা যদি বলেন তাহলে আমার একটু সুবিধে হয়।'

তাতে কার্তিকের আপত্তি নেই। সে বলল, 'আমি তেরো বছর বয়সে যন্তিপুরের রাজবাড়িতে গিয়ে হরবোলার খেলা দেখাই। রাজা খুশি হয়ে আমাকে ইনাম দেন। সেই থেকে আমার নাম হয়ে যায়। তুই কোনো রাজাকে খুশি করতে পারিস ত তোরও একটা গতি হয়ে যাবে। আমার দ্বারা

কিছু করা সম্ভব নয়।'

সুজন আর কী করে ? সে কাউকে চেনে না, কোথাকার কোন রাজবাড়িতে গিয়ে খেলা দেখাবে সে ? মনের দুঃখে সে বাড়ি ফিরে এল।

সুজনের গ্রামের নাম হল ক্ষীরা। ক্ষীরার উত্তরে তিন ক্রোশ দূরে একটা বড় মাঠ পেরিয়ে ছিল একটা গভীর বন। এই বনের নাম চাঁড়ালি। চাঁড়ালির বনে যত পাখি আর জানোয়ারের বাস তেমন আর কোনো বনে ছিল না। সুজন একদিন দিন থাকতে থাকতে সেই বনে গিয়ে হাজির হল। জানোয়ারে তার কোনো ভয় নেই, আর পাখিতে ত নে-ই-ই। এই বনে গিয়ে তিনটে নতুন নাম-না-জানা পাখির ডাক সে তুলল। সূর্যি যখন মাথার উপর থেকে পশ্চিমে নামতে শুরু করেছে, এমন সময় সুজন শুনতে পেল ঘোড়ার খুরের শব্দ, আর দেখল এক পাল হরিণ ছুটে পালিয়ে গেল।

কিছু পরেই সুজন দেখল যে বনের মধ্যে দিয়ে আসছে ঘোড়ার পিঠে এক রাজা, আর আরো পাঁচ-সাতটা ঘোড়ায় তার অনুচরের দল। দেখে সে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল, কারণ বনে অন্য মানুষ দেখবে সেটা সে ভাবেনি। এটা সে ভালোই বুঝল যে রাজা মৃগয়ায় বেরিয়েছেন।

এদিকে রাজাও সুজনকে দেখে অবাক।

'তুই কে রে ?' রাজা হাঁক দিয়ে জিগ্যেস করলেন ঘোড়া থামিয়ে।

সুজন হাত জোড় করে নিজের নাম বলল।

'তুই একা ঘুরে বেড়াচ্ছিস, তোর বাঘের ভয় নেই ?'

সুজন মাথা নেড়ে না বলল।

'তার মানে কি এ বনে বাঘ নেই ?' রাজা জিগ্যেস করলেন। 'শুনেছিলাম যে চাঁড়ালির বনে অনেক বাঘের বাস ?'

'বাঘ আপনার চাই ?'

'চাই বৈ কি। শিকারে এসেছি দেখতে পাচ্ছিস না ? বাঘ ছাড়া কি শিকার হয় ?'

'বাঘ খুঁজে পাননি আপনারা ?'

'না, পাইনি। হরিণ ছাড়া আর কিছুই পাইনি।'

'ও।'

সুজন একটুক্ষণ ভাবল ; তারপর বলল, 'বাঘ আছে, আর সে বাঘের ডাক

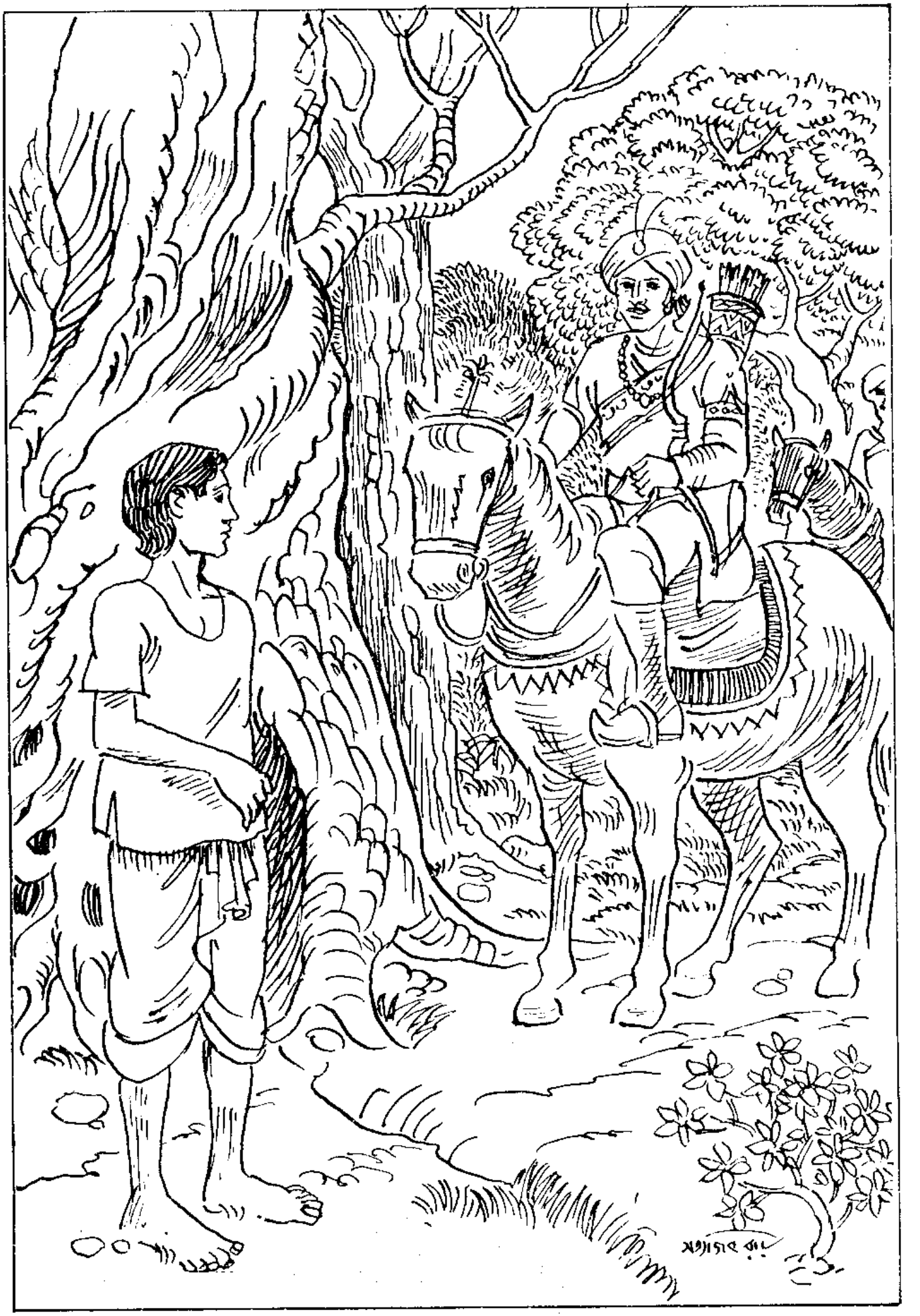
সত্যজিৎ রায়

আমি শুনিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আপনি কি সে বাঘ মারবেন, রাজামশাই ?"

'মারব না ? শিকার মানেই ত জানোয়ার মারা।'

'কিন্তু বাঘ আপনার কী ক্ষতি করল যে তাকে মারবেন ?'

রাজা আসলে খুব ভালো লোক ছিলেন। তিনি একটুক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, 'বেশ, আমি তোর কথা মানলাম। বাঘ আমি মারব না, কারণ সত্যিই সে আমার কোনো অনিষ্ট করেনি। কিন্তু সে যে আছে তার প্রমাণ কই ?"

সুজন তখন দুহাত চোঙার মতন করে মুখের ওপর দিয়ে সামনের দিকে শরীরটাকে নুইয়ে একটা বড় দম নিয়ে ছাড়ল একটা হুঙ্কার। অবিকল বাঘের ডাক। আর তার এক পলক পরেই বনের ভিতর থেকে উত্তর এল, 'ঘ্যাঁয়াঁওঁ !'

রাজা ত তাজ্জব।

'তোর ত আশ্চর্য ক্ষমতা,' বললেন রাজা। 'তুই থাকিস কোথায় ?'

'আজ্ঞে আমার গাঁয়ের নাম ক্ষীরা। এখান থেকে তিন ক্রোশ পথ।'

'তুই আমার সঙ্গে আমার রাজ্যে যাবি ? তার নাম জবরনগর। এখান থেকে ত্রিশ ক্রোশ। আমার মেয়ের বিয়ে আছে সামনের মাসে আজবপুরের রাজকুমারের সঙ্গে। সেই বিয়েতে তুই হরবোলার ডাক শোনাবি। যাবি ?'

'আজ্ঞে বাড়িতে যে বলতে হবে আগে।'

'তা সে তুই আজ বাড়ি চলে যা। আমরা বনে তাঁবু ফেলেছি। সেখানে রাত কাটিয়ে কাল সকালে ফিরব। তুই কাল সক্কাল সক্কাল চলে আসিস বাড়িতে বলে।'

''বেশ তাই হবে।'

॥ ২ ॥

সুজন বাড়ি ফিরে এসে মা-বাবাকে সব কথা বলল। দিবাকর ত মহাখুশি। বলল, এইবার ঠাকুর মুখ তুলে চেয়েছেন। তোর বোধ হয় একটা হিল্লে হল।

মা বলল, 'তুই যে যাবি, আর ফিরবি না নাকি ?'

'পাগল !' বলল সুজন। 'কাজ হয়ে গেলেই ফিরব। আর নাম-ডাক হলে

মাঝে মাঝে বেরিয়ে যাব, মাঝে মাঝে ফিরব।'

পরদিন ভোর থাকতে সুজন বেরিয়ে পড়ল। যখন চাঁড়ালির বনে পৌঁছাল তখন সূর্য তাল গাছের মাথা ছাড়িয়ে খানিকদূর উঠেছে। বনের ধারে একটু খুঁজতেই একটা খোলা জায়গায় জবরনগরের রাজার তাঁবু দেখতে পেল সুজন। রাজা দেশে ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হয়েই বসে আছেন। বললেন, 'তোকে একটা ঘোড়ায় তুলে নেবে আমার লোক, তুই তার সঙ্গেই যাবি!'

সুজনকে আগে ভালো ভালো মিঠাই আর ফল-মূল খেতে দিয়ে রাজা পাত্রমিত্র সঙ্গে করে রওনা দিলেন জবরনগর। ঘোড়ার পিঠে কোনোদিন চড়েনি সুজন, যদিও ঘোড়ার ডাক তার শেখা আছে। মহা আনন্দে রোদ থাকতে থাকতেই সুজন পৌঁছে গেল জবরনগর।

গাছপালা দালান-কোঠা পুকুর বাগান হাট-বাজারে ভরা এমন বাহারের শহর সুজন কখনো দেখেনি। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করে তার ভারী আশ্চর্য লাগল। সে রাজাকে জিগ্যেস করল, 'এত গাছপালা, এত বাগান, তবু একটাও পাখির ডাক নেই কেন?'

রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সে যে কত বড় দুঃখের কথা সে কী বলব তোকে। ওই যে দূরে পাহাড় দেখছিস, ওই পাহাড়ের নাম আকাশী। ওই পাহাড়ের গুহায় একটা রাক্ষস না খোক্কস না জানোয়ার কী জানি এসে রয়েছে আজ পাঁচ বছর হল। তার খাদ্যই হল পাখি। সে যে কী জাদু করে তা জানি না, পাখিরা সব আপনা থেকে দলে দলে উড়ে গিয়ে তার গুহায় ঢোকে, আর রাক্ষসটা তাদের ধরে ধরে খায়। এখন এই শহরে আর কোনো পাখি বাকি নেই। কেবল একটা হীরামন আছে আমার মেয়ের খাঁচায় রাজবাড়ির অন্দরমহলে।'

'কিন্তু তার খাবার ফুরিয়ে গেলে সে রাক্ষস বাঁচবে কি করে?'

'খাবার কি আর সে শুধু আমার শহর থেকে নেয়? পাহাড়ের উত্তরে আছে আজবপুর, পশ্চিমে আছে গোপালগড়—পাখির কি আর অভাব আছে?'

এই জানোয়ারকে কেউ দেখেনি কখনো?'

'না। সে গুহা থেকে বেরোয় না। আমি নিজে তীর-ধনুক নিয়ে গুহার মুখে অপেক্ষা করেছি, আমার সঙ্গে সশস্ত্র সৈন্য ছিল পঞ্চাশজন। কিন্তু সে

দেখা দেয়নি। গুহাটা অনেক গভীর ; মশাল নিয়ে তার ভিতরে কিছুদূর গিয়েও তার দেখা পাইনি।'

সুজন এমন অদ্ভুত ঘটনা কখনো শোনেনি। শুধু পাখি খায় এমন রাক্ষসও থাকতে পারে ? আর তাকে কোনোমতেই সায়েস্তা করা যায় না, এ ত বড় আজব কথা !

ততক্ষণে রাজার দল প্রাসাদে পৌঁছে গেছে। রাজা বলল, 'প্রাসাদের এক তলায় একটা ঘরে তুই থাকবি। কাল সকালে আমার মেয়েকে একবার শোনাবি তোর পাখি আর জানোয়ারের ডাক। আমার মেয়ের নাম শ্রীমতী। তার মতো বিদুষী মেয়ে আর ভূভারতে নেই। সে শাস্ত্র পড়েছে, ব্যাকরণ পড়েছে, ইতিহাস পড়েছে, গণিত পড়েছে, দেশবিদেশের রূপকথা সে জানে, রামায়ণ মহাভারত জানে। সে ঘরেই থেকেছে চিরটা কাল। সূর্যের আলো তার গায়ে লাগতে দিইনি, তাই তার মতো দুধে-আলতায় রং আর কোনো মেয়ের নেই।'

সুজন ত শুনে অবাক। মেয়েমানুষের এত বিদ্যেবুদ্ধি ? আর সে নিজে যে অবিদ্যের জাহাজ ! এই রাজকন্যার সঙ্গে ত কথাই বলা যাবে না।

'এই রাজকন্যারই কি বিয়ে হবে ?' সে জিগ্যেস করল রাজাকে।

'হ্যাঁ, এরই বিয়ে। আজবপুরের যুবরাজের সঙ্গে। সেও পণ্ডিত ছেলে, অনেক পড়াশুনো করেছে। রূপেগুণে সব দিক দিয়েই ভালো।'

রাজপ্রাসাদে পৌঁছে সুজনকে তার ঘর দেখিয়ে দিল রাজার একজন পরিচালক। রাজামশাই বললেন, 'আজ বিশ্রাম কর, কাল সকালে তোকে এরা নিয়ে আসবে আমার কাছে। তারপর তোর গুণের পরীক্ষা হবে।'

'একটা কথা রাজামশাই।' সুজন ওই পাখিখোর রাক্ষসের কথা তুলতেই পারছিল না।

'কী কথা ?'

'আকাশী পাহাড়টা এখান থেকে কত দূরে ?'

'চার ক্রোশ পথ। কেন ?'

'না, এমনি জিগ্যেস করছিলাম।'

রাজা যে তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন সেটা সুজন তার ঘর দেখেই বুঝতে পারল। দিব্যি বড় ঘর, তাতে চমৎকার নকসা করা একটা পালঙ্ক, আর তাছাড়াও আসবাব রয়েছে কাঠের আর শ্বেতপাথরের। পালঙ্কের বালিশের

মতো বাহারের নরম বালিশ সুজন কখনো চোখেই দেখেনি, ব্যবহার করা তো দূরের কথা।

রাত্তিরে খাবারও এলো এমন যা সুজন কোনোদিন খায়নি। কতো পদ, আর তাদের কী স্বাদ, কী গন্ধ ! সব শেষে মিষ্টান্নই এল পাঁচ রকম। এত খাবে সে কী করে ?

যতটা পারে তৃপ্তি করে খেয়ে সুজন ভাবতে বসল। সেই রাক্ষসের কথাটাই বার বার মনে পড়ছে তার। পাখির মতো এত সুন্দর জিনিস, আর সেই পাখিই এই রাক্ষস টপ্ টপ্ করে গিলে খায় ? এমনই তার খিদে যে শহরের সব পাখি সে শেষ করে ফেলেছে। একবার তার আস্তানাটা দেখে এলে হয় না ? সুজনের এখনো ঘুম পায়নি। বাইরে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। পাহাড় কোন দিকে সে তো দেখাই আছে, শুধু গুহাটা কোথায় সেটা খুঁজে বার করা।

সুজন খাট থেকে উঠে পড়ল। তারপর দুগ্গা বলে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। তাকে সকলেই চিনে গেছে, কাজেই ফটকে কেউ কিছু জিগ্যেস করল না।

চারিদিকে ফুটফুটে চাঁদের আলো, সুজন তারই মধ্যে সটান চলল আকাশী পাহাড় লক্ষ করে। অল্প কুয়াশায় পাহাড়টাকে মনে হয় ঝাপসা।

নিঝুম শহর দিয়ে দেড় ঘণ্টা হেঁটে সুজন গিয়ে পৌঁছল পাহাড়ের তলায়। চারদিকে জন-মানব নেই, রাতের প্যাঁচাও বোধহয় গেছে রাক্ষসের পেটে।

পাহাড়ের পাশ ধরে হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দিকটা পৌঁছাতেই সুজন দেখতে পেল মাটি থেকে ত্রিশ-চল্লিশ হাত উপরে একটা অন্ধকার গুহা।

এটাই নিশ্চয় সেই রাক্ষসের গুহা। মানুষও কি এই রাক্ষসের খাদ্য নাকি ? আশা করি নয়।

সুজন সাহস করে পাহাড় বেয়ে উঠে গেল।

এই যে গুহার মুখ। পাহাড়ের উল্টো দিকে চাঁদ, তাই গুহার ভিতরে মিশকালো অন্ধকার।

সুজনের মনে রাগ থেকে কেমন যেন একটা সাহস এসেছে। পাখিরা তার বন্ধু ; আর সেই বন্ধুরা যাচ্ছে এই রাক্ষসের পেটে, তাই এ রাগ।

সুজন অন্ধকার গুহার ভিতরটায় গিয়ে ঢুকল।

দশ পা ভিতরে যেতেই তাকে সেই দশ পা-ই ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে

হল।

গুহার ভিতর থেকে একটা ভয়ংকর হুঙ্কার শোনা গেছে। এমন বীভৎস ডাক কোনো জানোয়ারের মুখ দিয়ে বেরোয় না।

এটা রাক্ষস, আর রাক্ষস সুজনকে দেখেছে, আর দেখে মোটেই পছন্দ করেনি।

॥ ৩ ॥

সুজন এই ঘটনার পর আর সময় নষ্ট না করে প্রাসাদে তার ঘরে ফিরে এসেছিল। পরদিন সকালে একজন কর্মচারী এসে তাকে রাজার সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে গেল। রাজা এখনো সভায় যাননি। আগে তাঁর মেয়েকে শোনাবেন সুজনের পাখি আর জানোয়ারের ডাক, তারপর রাজকার্য। সুজন বুঝল মেয়ের উপর রাজার কত টান।

এদিকে রাজকন্যা শ্রীমতী কাল রাত্রেই শুনেছে সুজনের কথা—কী ভাবে বাঘের ডাক ডেকে সে জঙ্গলে বাঘ আছে প্রমাণ করে দিয়েছিল। শ্রীমতী এক বেড়াল ছাড়া কোনোদিন কোনো জানোয়ারের ডাক শোনেনি। পাখি যখন ছিল শহরে—আজ থেকে পাঁচ বছর আগে—তখনও সে তার হীরামন ছাড়া কোনো পাখির ডাক শোনেনি। ঘর থেকে সে বাইরেই বেরোত না, শুনবে কি করে? সে যে অসূর্যম্পশ্যা। যে সূর্যকে দেখেনি, তার ত প্রকৃতির সঙ্গে চোখের দেখাই হয় নি। অবিশ্যি বই পড়ে সে অনেক কিছুই জেনেছে, কিন্তু বইয়ে আর কত জানা যায়? চোখে দেখা আর কানে শোনায় যা হয়, শুধু বই পড়ে কি তা হয়? বাংলার পাখির নাম শ্রীমতীর মুখস্থ, কিন্তু সে সব পাখি কেমন ডাক ডাকে, কেমন গান গায়, তা সে কানে শোনেনি কখনো।

সুজন যখন গিয়ে অন্দর মহলের আঙিনায় পৌঁছাল, তখন শ্রীমতী তার ঘর থেকে আরেকটা ঘরে এসে বসেছে। এঘরে একটা খোলা জানালা আছে, তাই দিয়ে আঙিনায় কোনো গান বাজনা হলে তার আওয়াজ শোনা যায়। সেই আঙিনাতেই এই হরবোলা তার কারসাজি দেখাবে।

দেউড়িতে আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই রাজামশাই সুজনকে বললেন, 'কই, শুরু কর এবার তোর খেলা। আমার মেয়ে উপরে বসে আছে, সে

শুনতে পাবে।'

কালটা বসন্ত, তাই সুজন পাপিয়া আর দোয়েলের ডাক দিয়ে শুরু করল। মানুষের গলায় এমন আশ্চর্য পাখির ডাক কেউ শোনেনি কখনো। পাঁচ বছর পরে এই প্রথম জবরনগরে পাখির ডাক শোনা গেল।

শুরুতেই রাজকন্যার চোখে জল এসে গেছে। চাপা স্বরে বলল শ্রীমতী, 'আহা কী সুন্দর! পাখি এমন করে ডাকে? আর এই পাখিরা সব গেছে সেই রাক্ষসের পেটে? কী অন্যায়! কী অন্যায়!'

সুজন একটার পর একটা ডাক শুনিয়ে চলল। রাজার বুক গর্বে ভরে উঠল, আর রাজকন্যার প্রাণ ছটফট করতে লাগল। এমন যার ক্ষমতা, তাকে একবার চোখে দেখা যায় না?

ঘরের বাইরে বারান্দা, সে বারান্দা বাহারের কাপড় দিয়ে ঢাকা। সেই কাপড়ের এক পাশ ফাঁক করলে তবে নীচে দেখা যেতে পারে। রাজকন্যার পাশে তার সখী বসা, তাকে একবার ঘর থেকে সরানো দরকার। 'সুরধুনী, আমার জলতেষ্টা পেয়েছে, একটু খাবার জল এনে দে,' বলল রাজকন্যা।

জল আনতে সেই শোবার ঘরে যেতে হবে, তাতে কিছুটা সময় যাবে।

সুরধুনী চলে গেল।

শ্রীমতী এক ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এসে কাপড় ফাঁক করে দেখে নিল সেই ছেলেটিকে। সে এখন ফটিক-জলের ডাক ডাকছে। শ্রীমতীর দেখে বেশ ভালো লাগল ছেলেটিকে; তবে এটা সে বুঝল ছেলেটির পোষাকে যে সে গরিব।

সুরধুনী জল নিয়ে আসার আগেই শ্রীমতী তার জায়গায় ফিরে এসেছে।

এক ঘণ্টা চলল সুজনের হরবোলার খেলা। এমন খেলা জবরনগরের রাজবাড়িতে কেউ কোনোদিন দেখেনি। আর রাজকন্যা ত এমন সব ডাক শোনেইনি; তার চোখের সামনে একটা নতুন জগৎ খুলে গেছে—প্রকৃতির জগৎ, যার সঙ্গে এই ষোল বছরে তার কোনোদিন পরিচয়ই হয়নি। এই গরীব ঘরের ছেলেটি তার জীবনে একটা নতুন প্রাণ এনে দিয়েছে।

এই সব ভাবতে ভাবতেই শ্রীমতীর মনে পড়ল যে আসছে মাসে তার বিয়ে। যাকে সে বিয়ে করবে, সেই যুবরাজ রণবীর কথা দিয়েছে যে শ্রীমতীর পড়াশুনার ব্যবস্থা তার বাড়িতেও হবে। আর তার জন্য অন্দর মহলের

ভিতরে একটা ঘর রাখবে যাতে সূর্যের আলো কখনো প্রবেশ না করে। আলো লেগে রাজকন্যার রং যদি কালো হয়ে যায়!

সুজন কিন্তু রাজকন্যাকে দেখতে পায়নি। রাজা তাকে একটা হাতে আঁকা ছবি দেখিয়ে বলেছেন, 'এই দেখ আমার মেয়ের চেহারা।' ছবি দেখেই সুজনের মনে হয়েছে এ যেন স্বর্গের অপ্সরী। তারপর সুজন যখন শুনল যে রাজকন্যা তার হরবোলার ডাক শুনে মোহিত হয়ে গেছে, তখন গর্বে তার বুকটা ভরে উঠল। আর তাছাড়া রাজামশাই ইনামও দিয়েছেন ভালো ; একটা হীরের আংটি আর একশত স্বর্ণমুদ্রা। সুজন জানে, এই টাকায় তাদের বাকী জীবনটা স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

কেবল একটা কথা ভেবে তার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ওই রাক্ষসটাকে যদি সায়েস্তা করা যেত!

॥ ৪ ॥

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। এর মধ্যে সুজন বেশ কয়েকবার কাছাকাছির মধ্যে অন্য শহরে গিয়ে হরবোলার খেলা দেখিয়ে আরো কিছু রোজগার করে নিয়েছে, আর সে রোজগারের প্রায় সবটুকুই সে দেশে গিয়ে তার বাপের হাতে তুলে দিয়েছে। সে বেশ বুঝতে পারছে যে তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। যেটুকু সময় সে রাজবাড়িতে থাকে, তার অনেকটাই সে নতুন নতুন ডাক অভ্যাস করে কাটিয়ে দেয়। একথা সে কখনই ভুলতে পারে না যে সামনে বিয়ের সভায় তাকে খেলা দেখাতে হবে, জবরনগরের রাজার সুনাম তাকে রাখতে হবে।

যদিও বিয়ের ধুমধাম শুরু হয়ে গেছে, রাজকন্যা শ্রীমতীর মনের অবস্থা কী তা কেউ জানে না। তার জীবনটা যেমন চাপা, তার মনটাও তেমনি চাপা। তবে এটা ঠিক যে গত একমাসে তাকে হাসতে দেখেনি কেউ। সুজন প্রাসাদের নীচের ঘরে পাখির ডাক অভ্যাস করে, তার সামান্য কিছুটা শব্দ ভেসে আসে দোতলায় অন্দর মহলের এই অংশে। সেই ক্ষীণ শব্দ শুনে শ্রীমতীর মনটা দুলে ওঠে। আশ্চর্য গুণ এই যুবকের। না জানি কথাবার্তায় সে কেমন!

এই কৌতূহল এক মাসে চরমে পৌঁছে গেছে। যে এমন সব ডাক ডাকতে পারে, যে এমন সুপুরুষ অথচ সরল, সে লোক কেমন সেটা শ্রীমতীকে জানতে হবেই। সে একদিন সুরধুনীকে কথাটা বলেই ফেলল।

সুরধুনী আজ পাঁচ বছর ধরে শ্রীমতীর সখী। শ্রীমতীকে যে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয় সেটা সুরধুনী পছন্দ করে না। সে শ্রীমতীর কাছে বর্ণনা দেয় সকালের ফুটফুটে রোদে গাছপালা নদনদী মাঠঘাটের। পাখি কেমন জিনিস সে এককালে দেখেছে সেকথাও সে বলে।

'তোকে ভাই একটা কাজ করতেই হবে', শ্রীমতী বলল।

'কী কাজ ?'

'সেই হরবোলার ঘরে যাবার রাস্তাটা জেনে নিতে হবে।'

সুরধুনী কথা দিল সে জেনে দেবে। আর তারপর সত্যিই একদিন অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে প্রহরীকে শ্রীমতীর কাছ থেকে নেওয়া একটা মোহর ঘুষ দিয়ে সে নীচে এসে দেখে গেল সুজনের ঘর। সুজন তখন বসন্তবৌরীর ডাক অভ্যাস করছে।

সেই রাত্রে সুজন যখন খাওয়া-দাওয়া করে বিছানায় উঠতে যাবে তখন সুরধুনী এল তার ঘরে।

'এ কি !' বলে উঠল সুজন।

সুরধুনী ঠোঁটে আঙুল দিল। তারপর ইশারা করে ঘরে ডেকে নিল শ্রীমতীকে।

'তুমি !' অবাক হয়ে বলল সুজন। 'তোমার ছবি আমি দেখেছি !'

'তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম,' ধীর কণ্ঠে বলল শ্রীমতী। 'তুমি আমার সামনে নতুন জগৎ খুলে দিয়েছ।'

'কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে কী কথা বলব ? আমার ত বিদ্যে বুদ্ধি নেই। আমি পাঁচের নামতাও বলতে পারি না, আর তুমি শুনেছি অনেক লেখাপড়া করেছ। তাই—'

'তুমি সূর্য দেখেছ ?'

'হ্যাঁ। রোজ দেখি। সূর্য যখন ওঠে তখন আকাশে সিঁদুর লেপে দেয়। আবার যখন ডোবে তখনও। সূর্য ওঠার আগেই পাখিরা গান শুরু করে। সূর্য

ডুবলেই তারা তাদের বাসায় চলে যায়।'

'বসন্তের ফুল দেখেছ তুমি?'

'হ্যাঁ। এখনো দেখি। রোজই দেখি। লাল নীল হল্‌দে সাদা বেগুনী—কত রং! মৌমাছি এসে মধু খায়, প্রজাপতি উড়ে বেড়ায় ফুলের ধারে ধারে। কুঁড় থেকে ফুল হয়। সে ফুটে আবার ঝরে পড়ে। গাছের পাতায় বসন্তে কচি রং ধরে, শীতে সে পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে।'

'একটা কথা ভেবে বড় কষ্ট হয়।'

'কী কথা?'

'পাখিরা এত সুন্দর গান গায়,কিন্তু এখন সে সব পাখি চলে গেছে ওই রাক্ষসের পেটে। তাকে শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত আমার কিছুই ভালো লাগছে না।'

'কিন্তু তোমার যে সামনে বিয়ে। এখন ভালো না লাগলে চলবে কি করে? বিয়েতে কত আনন্দ!'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমার মুখে পাখির গান শোনার পর থেকে আর আনন্দ নেই। আমি বাবাকে বলেছি।'

'কী বলেছ?'

'যার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে, সে যদি ওই রাক্ষসকে মারতে পারে, তবেই আমি তাকে বিয়ে করব। আমাকে বিয়ে করার শর্তই হবে ওই।'

'সে না মেরে যদি আর কেউ মারে?'

'যে মারবে তাকেই আমি বিয়ে করব। যার সে শক্তি নেই সে মানুষই নয়।'

'তুমি খুব কঠিন শর্ত করেছ।'

'একথা কেন বলছ?'

'আমি সেই রাক্ষসের গুহায় গিয়েছিলাম। তার এক ডাকে আমি পালিয়ে এসেছি। সে বড় ভয়ানক ডাক।'

'শুনে আমি খুব দুঃখ পেলাম। আমি ভেবেছিলাম তুমি এত বাঘ ভাল্লুকের ডাক ডাকলে, তোমার বুঝি সাহস আছে। যাই হোক্, যে এই বিহঙ্গভুক্‌কে মারতে পারবে আমি তাকেই বিয়ে করব।'

'এর নাম বিহঙ্গভুক্ বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'আমি বইয়ে পড়েছি। বিহঙ্গ মানে পাখি।'

এইখানেই কথার শেষ হল। সুরধুনীর সঙ্গে শ্রীমতী আবার নিজের ঘরে চলে গেল।

॥ ৫ ॥

পরদিন সুজনের যেতে হল মরকতপুর। সেখানের রাজা হরবোলার ডাকে খুশি হয়ে সুজনকে ভালো বকশিস দিলেন। সুজন জবরনগরে ফিরে এল। শ্রীমতীর ফরমাশ মতো একবার রোজ তাকে পাখির ডাক শোনাতে হয়, আর রাজা রোজ তাকে বকশিস দেন।

এদিকে রাজার মনে গভীর চিন্তা। তার মেয়ে বেঁকে বসেছে, যে রাক্ষসকে মারতে পারবে তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। আজবপুরের যুবরাজ রণবীর তাই কালই সকালে আসছে জবরনগর। তাকে একা যেতে হবে আকাশীর গুহায়। সে সফল হলে তবেই শ্রীমতীকে বিয়ে করতে পারবে। সাহসী যোদ্ধা হিসেবে রণবীরের নামডাক আছে, তাই জবরনগরের রাজার ভরসা আছে সে হয়ত এই পরীক্ষায় সফল হবে।

এদিকে সুজন মনে মনে ভাবছে—যা ডাক শুনেছি রাক্ষসের, সে ত কোনদিন ভুলতে পারব না। এমন যার ডাক, তার চেহারা না জানি কেমন, আর শরীরের শক্তিই বা না জানি কেমন! আজবপুরের রাজকুমার কি পারবে মারতে এই রাক্ষসকে?

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার কিছু পরেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে আজবপুরের যুবরাজ জবরনগর এসে হাজির হল। তার গায়ে বর্ম, কোমরে তলোয়ার, পিঠে তূণ, হাতে ধনুক। তাছাড়া ঘোড়ার পাশে খাপের মধ্যে ঢোকানো রয়েছে একটা বল্লম।

এছাড়া রাজকুমারের সঙ্গে ছিল দুইজন অশ্বারোহী, যারা জালে করে শ্মশান থেকে ধরে এনেছিল তিনটে শকুনি। জাল সমেত এই শকুনিগুলোকে ফেলা হবে গুহার মুখে, তাহলেই রাক্ষস বেরোবে—এই ছিল তাদের মতলব।

জবরনগরের বেশ কিছু লোকও গুহার উল্টোদিকে সমতল ভূমিতে জড়ো হয়েছিল এই যুদ্ধ দেখার জন্য। জবরনগরের রাজা নিজে না এলেও, দূত পাঠিয়েছিলেন সংগ্রামের ফলাফল জানার জন্য।

যুবরাজ রণবীর এখন তৈরি। এইবার তার দুজন সহচর জাল সমেত শকুনিগুলিকে গুহার সামনে ফেলে শিঙায় ফুঁ দিয়ে জানিয়ে দিল যে তারা উপস্থিত। তারপর তারা দুইজন সরে গেল, শুধু ঘোড়ার পিঠে রইল রণবীর।

দর্শকের ভীড়ের মধ্যে যারা ছিল তাদের একজনের আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। সে হল সুজন হরবোলা। খবর পেয়ে সে সবার আগেই গিয়ে হাজির হয়েছে গুহার সামনে। কিন্তু কেন সে জানে না, তার মন বলছে যুবরাজ সফল না হলেই ভালো।

কিন্তু কই? রাক্ষস বার হয় না কেন? তার জন্যে এমন টোপ ফেলা হয়েছে, তবুও কেন সে গুহার মধ্যে বসে?

এদিকে যুবরাজের ঘোড়া অস্থির হয়ে ছটফটানি শুরু করেছে। এবার যুবরাজ সাহস করে গুহার দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিঙাও বেজে উঠল তিনবার, আর তার পরেই সকলের রক্ত হিম করে দিয়ে শোনা গেল এক বিকট হুঙ্কার, যার ফলে যুবরাজের ঘোড়া সামনের পা দুটো আকাশে তুলে যুবরাজকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে উল্টো মুখে দিল ছুট। তখন যুবরাজকেও ছুটতে হল ঘোড়ার পিছনে। বোঝাই গেল সে রাক্ষসের কাছে হার স্বীকার করেছে; যার এমন গর্জন তার সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস যুবরাজের নেই।

ভীড় করে যারা এসেছিল তারাও যে যেদিকে পারে চম্পট দিল। কেবল একজন—সুজন হরবোলা—মুখ গম্ভীর করে কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর ধীরপদে ফিরতি পথ ধরল।

রণবীরের পর আরও সাতটি দেশের সাতটি যুবরাজ বিহঙ্গভুক্‌কে মারতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তার ডাক শুনে পালিয়ে বাঁচল, আর সেই সঙ্গে রাজকন্যার বিয়েও পিছিয়ে যেতে লাগল, রাজার কপালেও দুশ্চিন্তার রেখা দিনে দিনে বাড়তে লাগল।

এই আটজন যুবরাজের শোচনীয় অবস্থা সুজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে; দানবের হুঙ্কারে শুধু ঘোড়ার নয়, ঘোড়সওয়ারের মনেও যে ত্রাসের সঞ্চার

মাঁড় ধরিল

হয়েছে সেটা সুজন নিজের চোখে দেখেছে।

এই আটজন হার মানার ফলে আর কোনো দেশের কোনো রাজপুত্র সাহস করে জবরনগরের এই দানব সংহারে এগোতে পারল না।

ন' দিনের দিন সকাল বেলা রাজা মন্দির থেকে পূজো সেরে যেই বেরিয়েছেন অমনি দেখলেন সুজন হরবোলা তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। রাজার মন খুব খারাপ, তাই গম্ভীর ভাবেই বললেন, 'কী সুজন, তোর আবার কী প্রয়োজন?'

সুজন বলল, 'মহারাজ,আমাকে একটা বল্লম দিতে পারেন?'

রাজা হবাক হয়ে বললেন, 'কেন, কী হবে বল্লম দিয়ে?'

'আমি বিহঙ্গভুক্‌কে মারার একটা চেষ্টা দেখব।'

'তোমার কি মতিভ্রম হল নাকি?'

'একবার দেখিই না চেষ্টা করে, মহারাজ। সে যখন প্রাণী, তখন তার প্রাণ আছে, আর প্রাণ যদি থাকে তাহলে তার কলিজা আছে। সেই কলিজায় যদি বল্লমটা গেঁথে দিতে পারি ত সে নির্ঘাৎ মরবে।'

'কিন্তু সে ত গুহা থেকে বারই হয় না।'

'ধরুন যদি আজ বেরোয়! তার মতিগতি ত কেউ জানে না।'

রাজা একটু ভাবলেন সুজনের দিকে চেয়ে। তারস্বাস্থ্যটা যে ভাল, শরীরে যে শক্তি থাকার সম্ভাবনা, সেটা তাকে দেখলে বোঝা যায়।

অবশেষে রাজা বললেন, 'ঠিক আছে, বল্লমের অভাব নেই। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোর হাবভাবে মনে হয় তুই এ কাজটা না করে ছাড়বি না।'

বল্লম জোগাড় হল অল্পক্ষণের মধ্যেই। এবার সুজন ঘোড়াশাল থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে বল্লম হাতে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আকাশীর দিকে রওনা দিল।

এদিকে রাজার সুজনের উপর একটা মমতা পড়ে গেছে; ছেলেটার কী হয় দেখবার জন্য তিনিও ব্যস্ত হয়ে একটা ঘোড়ায় চড়ে চললেন পাহাড়ের দিকে।

সুজন গুহার সামনে পৌঁছনর আগেই ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল। সে জানে সে যদি ঘোড়ার পিঠে থাকে তাহলে ঘোড়া ভয় পেয়ে ছুট দিলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে পালাতে হবে।

গুহার ভিতরে দিনের বেলা রাতের মতো অন্ধকার, কারণ গুহাটা উত্তরমুখী।

ইতিমধ্যে রাজাও পৌঁছে গেছেন ; তিনি একটু দূর থেকে ঘোড়ার পিঠে চেপেই ঘটনাটা দেখবেন। আজ লোকের ভিড় নেই, কারণ শহরে ঢ্যাঁড়া পড়ে গেছে যে আর কোনো রাজপুত্র রাক্ষসকে মারতে আসবে না।

সুজন হাতে বল্লম নিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল গুহার দিকে। চারিদিক নিস্তব্ধ। পাখি নেই, তাই এই অবস্থা, না হলে সকালে পাখি না ডেকে পারে না।

এবার সুজন ঠাকুরের নাম জপ করে একবার সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিরাট একটা দম নিয়ে সেই দম ছাড়ার সময় তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই নদিনে শেখা একটা ভয়ঙ্কর ডাক ছাড়ল। এই ডাকে রাজার ঘোড়া ভড়কে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠেছিল, কিন্তু রাজা কোনো মতে তাকে সামলালেন।

এইবার এল সেই হুঙ্কারের জবাব—আর সেই সঙ্গে গুহা থেকে এক লাফে বাইরে রোদে এসে পড়ল যে প্রাণীটা সেটা মানুষ না রাক্ষস না জানোয়ার তা কেউই সঠিক বলতে পারবে না। বরং বলা চলে তিনে মিশে এক কিম্ভূত-কিমাকার প্রাণী যাকে দেখলে মানুষের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায়।

সুজন হরবোলা কিন্তু আর কিচ্ছু দেখল না, দেখল শুধু প্রাণীটার যেখানে কলিজাটা থাকার কথা সেই জায়গাটা। সেটার দিকে তাগ করে সে প্রাণপণে চালিয়ে দিল তার হাতের বল্লমটা। তারপর আর তার কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হয়ে চোখ খুলে সুজন প্রথমেই দেখতে পেল সেই মুখটা যেটা আঁকা ছবিতে দেখে তার মনটা নেচে উঠেছিল।

শ্রীমতীর পাশেই রাজা দাঁড়িয়ে ; বললেন ; 'রাক্ষস মরেছে, তাই তোমার হাতেই দিলাম আমার মেয়েকে। আজ থেকে সাতদিন পরে বিয়ের লগ্ন। তোমার বাপ-মাকে খবর দিতে লোক যাবে ক্ষীরা গ্রামে। তারাও এখানেই থাকবে বিয়ের পর, আর তুমিও থাকবে।'

'আর আমার লেখাপড়া ?'

শ্রীমতী হেসে বলল, 'আমি বলেছি সে ভার আমার। পাঁচের নামতা দিয়ে শুরু—বিয়ের পর দিন থেকেই। আর যদ্দিন না দেশে পাখি আসছে তদ্দিন

তুমি আমাকে পাখির ডাক শোনাবে।'

'তাহলে একটা কথা বলি ?'

'বলো।'

'তুমি আর ঘরের মধ্যে বন্দী থেকো না।'

'না, আর কোনোদিন না।'

'আর তোমার হীরামনটাকে ছেড়ে দাও। খাঁচায় পাখি রাখতে নেই। ওরা আকাশে উড়তে পারে না ; ওদের বড় কষ্ট হয়।

শ্রীমতী মাথা নেড়ে বলল, 'বেশ, তাই হবে।'

গঙ্গারামের কপাল

নদীর ধারে খোলামকুচি দিয়ে ব্যাঙবাজি খেলতে খেলতে হঠাৎ গঙ্গারামের চোখে পড়ল পাথরটা। এ নদীতে জল নেই বেশি ; যেখানে সবচেয়ে গভীর সেখানেও হাঁটু ডোবে না। জলটা কাচের মতো স্বচ্ছ, তাই তার নীচে লাল নীল সবুজ হলদে খয়েরি অনেক রকম পাথর দেখা যায়। কিন্তু এমন পাথর গঙ্গারাম এর আগে কোনোদিন দেখেনি। যত রকম রং হয় রামধনুতে, সব রং আছে এই পাথরে। আকারে একটা পায়রার ডিমের মতো। গঙ্গারাম জল থেকে পাথরটা তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। 'বাঃ, কী সুন্দর !'—আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ল তার মুখ থেকে। তারপর সেটাকে সে ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে বাড়িমুখো রওনা হল।

গঙ্গারাম থাকে বৈকুণ্ঠ গ্রামে। তার বাপ-মা মড়কে মারা গেছে যখন, তখন গঙ্গারামের বয়স সাড়ে চার। সে তার মামা গোপীনাথের ঘরে মানুষ হয়েছে। এখন তার বয়স আঠারো। তাকে গ্রামের সকলেই ভালবাসে, কারণ কারও কোনো উপকারে আসতে পারলে গঙ্গারাম সবচেয়ে বেশি খুশি হয়। তাই সকলেই বলে গঙ্গারামের মতো এমন সরল সদাশয় ছেলে আর দুটি হয় না। এছাড়া গঙ্গারামের চেহারাটিও ভাল, গ্রামের যাত্রা হলে সে তাতে রাজপুত্তুর সাজে আর অভিনয়ও করে দিব্যি। গঙ্গারামের অবস্থা যে ভাল তা নয় মোটেই। মামার চাষের জমি আছে কিছুটা, সেটা সে এখন নিজে চষতে পারে না বাতের জন্য, তাই খেতের কাজ গঙ্গারামকেই করতে হয়। যা ফসল হয় তাতে তাদের কোনোমতে চলে যায়। গঙ্গারামের একটা মামাতো ভাই আছে তার চেয়ে তিন বছরের বড়, নাম রঘুনাথ। রঘুনাথ কুসঙ্গে পড়ে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়, তাতে তার শাস্তি হয় তিন বছরের হাজতবাস। সেই

তিন বছর কাটতে আর তিন মাস বাকি। বাবা গোপীনাথ বলেছে ছেলেকে আর বাড়িতে ফিরিয়ে নেবে না।

নদীর ঘাটে খেলা সেরে বাড়ি ফেরার পথে গঙ্গারাম একবার সুবলকাকার বাড়ি হয়ে গেল। সুবলকাকার কদিন থেকে সর্দি জ্বর। তার একটা পা খোঁড়া, তাই সে লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারে না। গঙ্গারাম তাকে এসে দেখার জন্য শশীকবিরাজকে খবর দেয়, শশী রুগি দেখে ঔষধ বলে দিয়ে যায় চাকুলে পাতার রস। সে পাতাও গঙ্গারাম বনবাদাড়ে ঘুরে বিছুটির কামড় খেয়ে জোগাড় করে এনে দেয়।

আজ গঙ্গারাম দেখল সুবলকাকা অনেকটা ভাল। একবার মোক্ষদা-বুড়ির বাড়িতেও যাবার ইচ্ছা ছিল, বুড়ি গ্রামের এক প্রান্তে একা থাকে সেই জন্য, কিন্তু সুবলকাকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখল আকাশে মেঘের ঘনঘটা।

গঙ্গারাম পা চালিয়ে বাড়িমুখো চললেও বৃষ্টি এড়াতে পারল না। অবিশ্যি বৃষ্টিতে ভিজতে তার ভালই লাগে, কিন্তু ও মা—আজ যে জলের সঙ্গে শিল পড়তে শুরু করল! আর এমন শিল গঙ্গারাম তার বাপের জন্মে দেখেনি। একেকটা শিল যেন একেকটা তাল। ফটাস্ ফটাস্ করে রাস্তায় পড়ছে আর ফেটে চৌচির হয়ে বরফ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। যদি একটা মাথায় পড়ে?

মাথায় পড়ল ঠিকই, তবে সেটা গঙ্গারামের নয়। শ্রীনিবাস-ময়রার বুড়ো বাপ ভুজঙ্গ লাঠি হাতে ঠক্ ঠক্ করে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে, সোজা তার মাথায় একটা শিল পড়ে গঙ্গারামের চোখের সামনে বুড়ো মাথা ফেটে অক্কা পেল। আর তারপর গাঁয়ের কেলো কুকুরটাও ম'ল মাথায় ওই রাবুনে শিল পড়ে। গঙ্গারাম ভেবেছিল তেলিপাড়ার বুড়ো অশ্বত্থ গাছটার তলায় আশ্রয় নেবে, কিন্তু সেই সঙ্গে শিল কুড়িয়ে নিয়ে তাতে কামড় দেবার লোভটাও সামলাতে পারল না। অথচ গাঁয়ের সব লোক হয় গাছতলায় না হয় বাড়ির দাওয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। দু'একজন গঙ্গারামকে রাস্তায় দেখে চেঁচিয়ে তাকে সাবধান করে দিল, কিন্তু গঙ্গারাম তাদের কথায় কান দিল না। আর এও ঠিক যে, তার চতুর্দিকে শিল পড়লেও তার গায়ে পড়েনি। গঙ্গারামের কপাল মন্দ বলেই সকলে জানত—যদিও গঙ্গারাম কোনোদিন নিজেকে দুঃখী বলে মনে করেনি—কিন্তু আজ যে ঘটনা ঘটল তাতে বলতেই হয় যে তার কপাল খুলে গেছে।

এই ঘটনার তিনদিন পরে খেতে জমি চষতে গিয়ে গঙ্গারামের লাঙলে খটাং করে মাটির তলায় কী যেন একটা লাগল। গঙ্গারাম মাটি খুঁড়ে দেখল সেটা একটা পিতলের কলসি, তার মুখটা একটা পিতলের ঢাকনা দিয়ে বন্ধ, আর সেই ঢাকনা একটা লাল কাপড় জড়িয়ে তাকে গেরো দিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে সহজে না খোলে।

খেতে কাজ সেরে গঙ্গারাম কলসিটা বাড়িতে নিয়ে এল। বেশ ভারী কলসি ;গঙ্গারামের গায়ে জোর আছে তাই সে বইতে পারল, না হলে দু'জন লোক লাগত।

বাড়িতে এসে কাপড়ের গেরো খুলে ঢাকনা তুলে গঙ্গারাম দেখল কলসিটার ভিতর অনেকগুলো গোল গোল হলদে চাকতি রয়েছে, যেগুলো দিনের আলোতে ঝলমল করছে। গঙ্গারাম চোখে কখনও মোহর দেখেনি, নইলে সে বুঝত যে সেগুলো সবই মোহর। এই এক কলসির মধ্যে যত স্বর্ণমুদ্রা ছিল তাতে একটা প্রাসাদ বানানো যায়। কিন্তু গঙ্গারাম ভাবল—না জানি এগুলো কিসের চাকতি। যেইভাবে ছিল সেইভাবেই পড়ে থাক।

কলসির মুখে আবার ঢাকনা দিয়ে সেটাকে কাপড় দিয়ে বেঁধে গঙ্গারাম খাটের তলায় চালান দিল ; মামাকেও বলল না সেটার বিষয় কিছু।

এর ক'দিন পরে আরেকটা ঘটনায় বোঝা গেল গঙ্গারামের কপাল ফিরেছে। মাঝরাত্তিরে গঙ্গারামের পাড়ায় অন্তা ঘোষের বাড়িতে আগুন ধরল। গঙ্গারামের সাতটা বাড়ি পরেই অন্তা ঘোষের বাড়ি। পাড়ার সকলের ঘুম ভেঙে গিয়ে চারিদিকে হৈহৈ চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল, পুকুর থেকে বালতি বালতি জল এনে হাতে হাতে সে জল চালান হয়ে আগুনে ঢালা হল। কিন্তু সর্বগ্রাসী আগুন এক ঘরের চাল থেকে আরেক ঘরের চালে ছড়াতে লাগল। সাড়ে চার ঘণ্টা লাগল আগুন নেবাতে, কিন্তু আশ্চর্য এই যে চারপাশের বাড়ি পুড়ে গেলেও গঙ্গারামের বাড়ি সে আগুন ছোঁয়নি। গঙ্গারাম নিশ্চিন্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "যাক, বাঁচা গেল। আমাদের বাড়িতে আগুন ধরলে বাতের রুগি মামাটা হয়তো পুড়েই মরত।"

এই ঘটনার পর গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল গঙ্গারামের সৌভাগ্যের কথা। কেউ কেউ এসে জিগ্যেস করল, "হ্যাঁ রে গঙ্গা, তোর ব্যাপার কী বল তো ? তোকে ত চিরদুঃখী বলেই জানি, কিন্তু তোর এমন

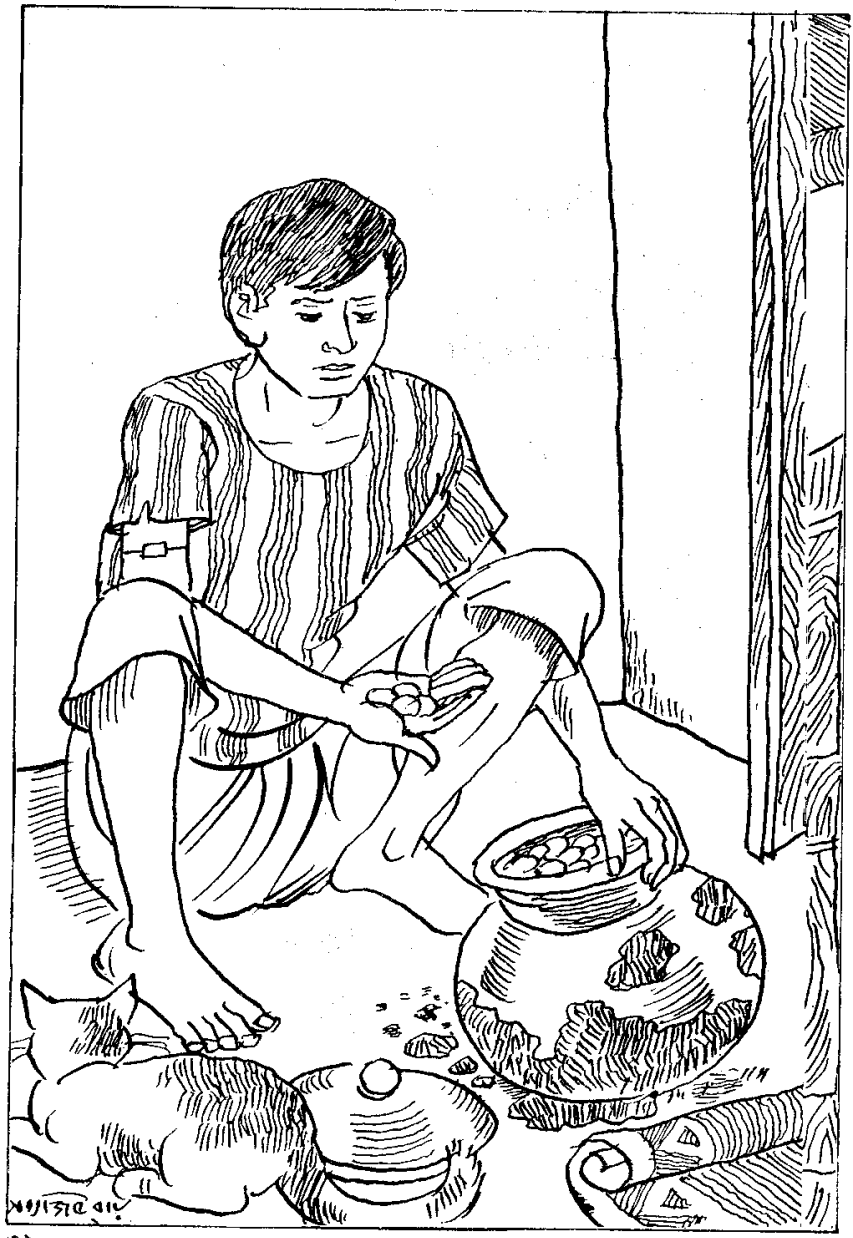

ভাগ্য ফিরল কী করে ?

গঙ্গারাম একগাল হেসে বলে, "কপালের কথা কেউ কি কিছু বলতে পারে ? ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন বটে, কিন্তু কেন তা ত বলতে পারব না !"

গঙ্গারামের একবারও মনে হল না যে, তার ট্যাঁকে যে পাথরটা গোঁজা থাকে সেই পাথরই তার কপাল ফিরিয়ে দিয়েছে।

॥ ২ ॥

গঙ্গারামের মামাতো ভাই রঘুনাথ হাজত থেকে ছাড়া পেয়ে তার বাড়িতে আসার পথেই হলধরের দোকান থেকে মুড়ি কিনে খেতে খেতে গঙ্গারামের আশ্চর্য কপালের কথা শুনল। শুনে তার মনে হল, এটা কেমন করে হয় ? হঠাৎ একটা লোকের ভাগ্য ফিরে যায় কী করে ? এ ব্যাপারে একটু খোঁজখবর করতে হবে ত !

খিদে মিটিয়ে বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই তার বাপের কাছে মুখ-ঝামটা খেতে হল রঘুনাথের। "এ-বাড়িতে তোর ঠাঁই হবে না," সোজা বলে দিলেন বাপ, "তুই অন্য ব্যবস্থা দ্যাখ।"

রঘুনাথ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখল গঙ্গারাম মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছে। "কী দাদা, অ্যাদ্দিনে ছাড়া পেলে বুঝি ?" গঙ্গারাম জিগ্যেস করল রঘুনাথকে। "কিন্তু বাপ তোমার উপর খাপ্পা হয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করেছ ?"

"করেছি," বলল রঘুনাথ। "আমি এ বাড়িতে থাকার জন্য আসিনি। আমার অন্য ডেরা আছে কেষ্টপুরে। আমি এসেছি একবার তোর সঙ্গে দেখা করে যাব বলে।"

"সে ত ভাল কথা," বলল গঙ্গারাম।

"তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল।"

"কী কথা ?"

"তোর কপাল ফিরেছে বলে শুনলাম। ব্যাপারটা কী ?"

"আমি আর কী বলব দাদা। যিনি মাথার উপর আছেন, তাঁর কখন কী

মর্জি হয় তা কি আমরা বলতে পারি ?"

রঘুনাথ বুঝল যে গঙ্গারাম যা বলছে তা সরল মনেই বলছে। তার কাছে থেকে খুব বেশি কিছু জানা যাবে না। সে পোঁটলা কাঁধে আবার বেরিয়ে পড়ল। কেষ্টপুরে সত্যিই তার একটা ডেরা আছে। তার দলের যে পাণ্ডা, যাকে পেয়াদায় ধরতে পারেনি, সেই মহেশ থাকে কেষ্টপুরে। জেল খেটে রঘুনাথের এবার সৎপথে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দুষ্কর্ম তার মজ্জায় ঢুকে গেছে, তাই তার পুরনো দল সে ছাড়তে চায় না।

তবে কেষ্টপুর যাবার আগে সে গেল হরিতাল, অঘোর গনতকারের কাছে। অঘোর শুধু গুনতে জানে না, সে নানারকম মন্তর-তন্তর জানে। লম্বা, চিমড়ে মানুষটা, গায়ের রং একেবারে আলকাতরার মতো, বয়স কত তা কেউ জানে না।

অঘোর রঘুনাথকে দেখেই বলল, "কয়েদখানা থেকে ছাড়া পেলি ? তবে তোর কিন্তু কপালে দুঃখু আছে, তোকে আবার হাজতে যেতে হবে। এই বেলা কুসঙ্গ পরিত্যাগ কর।"

"সে সব কথা থাক," বলল রঘুনাথ। "আমি আমার পিসতুতো ভাইয়ের কথা জানতে এসেছি।"

"কে, গঙ্গারাম ?"

"তার কপাল ফিরল কী করে বলতে পারেন ?"

"দাঁড়া, একটু হিসেব করে দেখি।"

অঘোর গনতকার তার তক্তপোশে বসে একটা খেরোর খাতায় খাগের কলম দিয়ে কয়েকটা নকশা এঁকে প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপব বলল, "সে তো এখন বিস্তর ধনের মালিক।"

"ধন ? কই, ধনদৌলত ত কিছু দেখতে পেলাম না।"

"কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি।"

"হঠাৎ তার কপাল ফিরল কেন ? সে কি দেবতার বর পেল নাকি ?"

"না। সে পেয়েছে একটা পাথর।"

"পাথর ?"

"হ্যাঁ, পাথর। তার জোরেই তার কপাল ফিরেছে। এই পাথরের নাম সাতশিরা। তার বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে। তবে সে নিজে তা বোঝে না। সে

অতি সরল মানুষ।"

"তার ধন কোথায় আছে বলতে পারেন ?"

"তার খাটের নীচে। তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।"

রঘুনাথ গনতকারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সে সোজা গেল কেষ্টপুর। তার লক্ষ্য মহেশ চোরের বাড়ি।

মহেশের বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি, পাকানো শরীর, নাকের নীচে পুরু গোঁফ আর গালে গালপাট্টা।

"দাদা !" বলল রঘুনাথ মহেশের হাত ধরে, "তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা !"

"কী ব্যাপার ?"

রঘুনাথ তাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল।

"এই কথা ?" শুনে বলল মহেশ। "খাটের তলায় আছে পেতলের ঘটি ?"

"হ্যাঁ, দাদা ! তুমি আনতে পারলে তিনের দুই ভাগ তোমার। এক ভাগ আমার।"

"তা বেশ," বলল মহেশ। "পরশু অমাবস্যা। পরশু যাব।"

মহেশের মতো চতুর চোর এ-তল্লাটে আর কেউ ছিল না। সে যে কতবার পেয়াদার চোখে ধুলো দিয়েছে তার হিসেব নেই। অমাবস্যার রাতে সিঁদকাঠি নিয়ে বৈকুণ্ঠগ্রামে গঙ্গারামের বাড়িতে এসে সে কাজ শুরু করে দিল। নিশুতি রাত, ফাল্গুন মাস, কিন্তু শীত এখনও পুরোপুরি যায়নি। মহেশ এসে পৌঁছেছে রাত তিনটেয়, যখন লোকের ঘুম হয় সবচেয়ে গভীর। এসেই প্রায় শব্দ না করে সে সিঁদ কাটতে শুরু করে দিয়েছে।

কিন্তু তাকে বেশিদূর এগোতে হল না। দু'দিন হল বৃষ্টি হয়ে গেছে, শীতকালের লম্বা-ঘুম-ভাঙা এক কালসাপ ছিল কাছাকাছির মধ্যে, সেটা নিঃশব্দে এসে মহেশের গোড়ালিতে মারল একটা ছোবল। মহেশের হাত থেকে সিঁদকাঠি পড়ে গেল, আর দু'মিনিটের মধ্যে তার নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

পরদিন সকালে গঙ্গারামই দেখল প্রথমে চোরের মৃতদেহ। সে বুঝল কী হয়েছে, কিন্তু তার বাড়িতে চোর সিঁদ কাটতে আসবে কেন সেটা সে বুঝল না।

এদিকে মহেশের কী দশা হয়েছে সেটা রঘুনাথ জানতে পেরেছে। সে

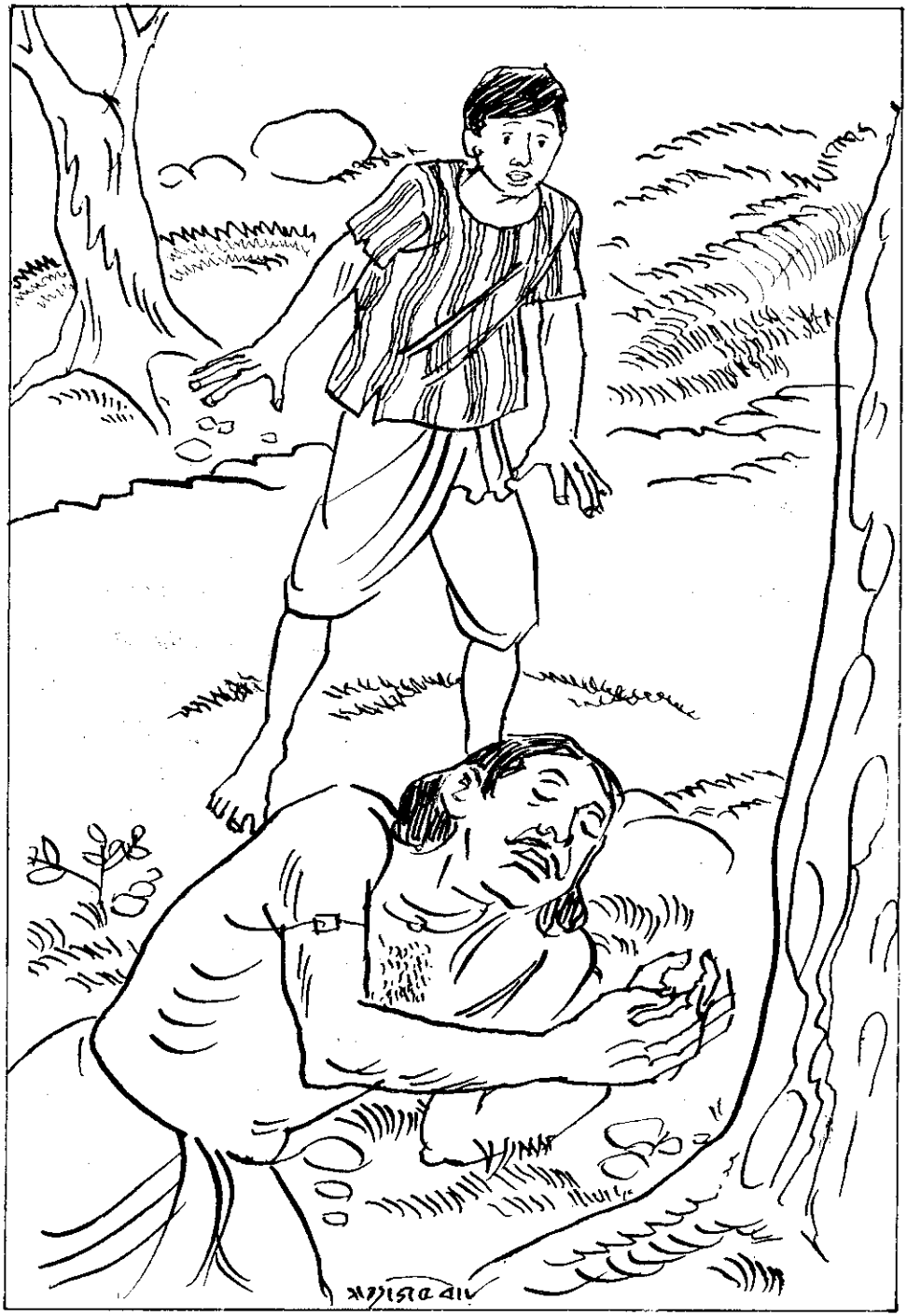

বুঝল তার পিস্‌তুতো ভাইয়ের কী আশ্চর্য কপাল। এইভাবে চুরি করে ত তার কাছ থেকে টাকা আদায় করা যাবে না। অন্য কী পন্থা নেওয়া যায় সেই নিয়ে সে ভাবতে বসল।

এদিকে গঙ্গারামের যে কপাল খুলেছে তার আরো প্রমাণ পাওয়া গেছে। তার মামার বাত আপনা থেকেই অনেকটা ভাল হয়ে গেছে; মামার মেজাজটা ছিল খিটখিটে, আজকাল সেটাও বদলে গিয়ে অনেক নরম হয়ে গেছে। মামা বলছে গঙ্গারামের জন্য এবার একটা পাত্রী খুঁজতে হবে। গঙ্গারাম এটাকেও কপাল ফেরার লক্ষণ বলে মনে করে, কারণ বিয়েতে তার আপত্তি নেই। বেশ একজন সুখ-দুঃখের সাথী হবে, ঘরকন্নার কাজ করার লোক হবে, আর সে মেয়ে যদি ফুটফুটে হয় তা হলে ত কথাই নেই। ফুল যেমন সুন্দর, সকাল-সন্ধ্যার আকাশ যেমন সুন্দর, পাখির ডাক যেমন সুন্দর, তেমনি তার বউও সুন্দর হয় এটা গঙ্গারাম চায়।

এই সময় একদিন এক হাটবারে হাটে ঢ্যাঁড়া শোনা গেল। বৈকুণ্ঠগ্রাম থেকে সাত ক্রোশ দূরে কনকপুর শহর, সেই শহর থেকে ঢ্যাঁড়া দিতে এসেছে। ঘোষণাটা এই—

কনকপুরের রাজকন্যার একটা সাতশিরা পাথর ছিল, সেটা একটা বাঁদর রাজবাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে নিয়ে যায়। সেই থেকে রাজবাড়িতে নানা দুর্ঘটনা ঘটেছে। রাজকন্যার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, তার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। এই সাতশিরা পাথরে রামধনুর সাতটা রঙই শিরায় শিরায় ফুটে বেরোয়। সে পাথর যদি কারও কাছে থেকে থাকে তা হলে সেটা ফেরত দিলে রাজা সে-লোককে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবে।

গঙ্গারাম শুনল ঘোষণাটা, তারপর একটা গাছের আড়ালে গিয়ে ট্যাঁক থেকে পাথরটা বার করে দেখল সেটার দিকে মন দিয়ে। হ্যাঁ, এতেও ত শিরায় শিরায় সাতটা রঙই দেখা যায়। এই কি তা হলে সাতশিরা পাথর?

গঙ্গারাম মনে মনে ঠিক করল সে কনকপুর যাবে, আর গিয়ে রাজাকে জিগ্যেস করবে এই পাথরই সেই পাথর কি না। যদি তাই হয় তা হলে সে পাথরটা ফেরত দিয়ে দেবে। সেটা তার সাধের জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু রাজকুমারীর অবস্থা শুনে তার মনে আঘাত লেগেছে। কারও দুঃখ গঙ্গারাম সইতে পারে না। সে দুঃখ দূর করার ক্ষমতা যদি তার থাকে তা হলে সে

নিশ্চয়ই তা করবে।

এদিকে কেষ্টপুরেও এই একই ঢ্যাঁড়া পড়েছে, একই ঘোষণা হয়েছে, আর সেটা শুনেছে রঘুনাথ। তার মন বলল তার পিসতুতো ভাইটা যা বোকা, সে নিশ্চয়ই পাথর ফেরত দিতে কনকপুর যাবে। সে নিজে কনকপুরের রাস্তায় ঝোপের পিছনে লুকিয়ে থাকবে, আর ভাই এলেই তাকে ঘায়েল করে তার কাছ থেকে পাথরটা নিয়ে নেবে। নিয়ে সেটা সে নিজের কাছেই রাখবে, রাজাকে ফেরত দেবে না।

গঙ্গারাম পরদিন সক্কাল সক্কাল চাদরের খুঁটে মুড়ি বাতাসা বেঁধে নিয়ে দুগ্গা বলে কনকপুর রওনা দিল।

তিন ক্রোশ পথ যাবার কিছু পরে একটা বনের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে রঘুনাথ হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে ধেয়ে এল গঙ্গারামের দিকে। গঙ্গারাম কিছুই টের পায়নি, কারণ তার পিছন দিক দিয়ে নিঃশব্দে এসেছিল রঘুনাথ। কিন্তু হলে কী হবে? গঙ্গারামের ট্যাঁকে সাতশিরা পাথর। সে লাঠি তার মাথায় পড়তেই সেটা শোলার মতো মট করে ভেঙে গেল। কাণ্ড দেখে রঘুনাথ দিল চম্পট, কারণ সে জানে গঙ্গারামের সঙ্গে খালি হাতে সে পেরে উঠবে না।

কনকপুর পৌঁছাতে গঙ্গারামের দুপুর পেরিয়ে গেল। রাজবাড়িটা অনেক দূর থেকেই দেখা যায়। সে সটান চলে গেল ফটকের সামনে। সেখানে প্রহরী তাকে রুখতে সে বলল, "আমি রাজকন্যার জন্য সাতশিরা পাথর এনেছি।"

প্রহরী পাথরটা দেখতে চাইলে গঙ্গারাম ট্যাঁক থেকে বার করে দেখাল। তাতে প্রহরী শুধু তার পথই ছেড়ে দিল না, আরেকজন প্রহরীকে বলে রাজার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়ে দিল।

রাজা রাজসভায় যাননি, মন্ত্রী রাজকার্য চালাচ্ছেন, রাজা মনের দুঃখে অন্দরমহলে শয্যা নিয়েছেন।

গঙ্গারাম রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে গড় করে বলল, "মহারাজ, আমি একটা পাথর এনেছি, সেটা সাতশিরা কি না যদি আপনি দেখে নেন।"

রাজা উঠে বসলেন, তাঁর চোখে আশার ঝিলিক।

"কই, দেখি তোমার পাথর।"

গঙ্গারাম দেখাল।

রাজার দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। "এই তো সেই পাথর!" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

তারপর রাজা গঙ্গারামের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি দাঁড়াও। তোমার পাওনা পুরস্কারটা তোমাকে দিই; আর তোমার সঙ্গে লোক দিয়ে দিচ্ছি, সে তোমাকে ঘোড়ায় করে তোমার গ্রামে পৌঁছে দেবে। এ-টাকা সঙ্গে নিয়ে হেঁটে যাওয়া নিরাপদ নয়।"

কোষাগার থেকে একজন কর্মচারী একটা মখমলের থলিতে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এনে গঙ্গারামকে দিল। গঙ্গারাম থলি খুলেই বলল, "আরে, এ জিনিস ত আমার অনেক আছে—এর চেয়ে বেশি আছে। খেতে চাষ করতে গিয়ে মাটির তলা থেকে পেয়েছি। এ জিনিস আর আমার লাগবে না, যথেষ্ট আছে।"

রাজা ত অবাক। এমন কথা তিনি কখনও শোনেনি। তিনি বললেন, "এটা তোমার পুরস্কার, তোমার পাওনা। তোমায় নিতেই হবে।"

"তবে দিন। আপনি যখন এত করে বলছেন তখন না বলব না। কিন্তু একটা কথা বলার ছিল, রাজামশাই।"

"কী কথা?"

"যাকে এনে দিলাম সাতশিরা পাথর, সেই রাজকন্যাকে বড় দেখতে ইচ্ছা করছে। আমি কোনোদিন রাজকন্যা দেখিনি।"

রাজা চোখ কপালে তুলে বললেন, "এ কেমন কথা বললে তুমি! রাজকন্যাকে দেখা কি মুখের কথা? সে থাকে তার নিজের ঘরে; তার বিয়ের কথা হচ্ছে। সে ত আর খুকি নয়!"

"সে ত আমারও বিয়ের কথা হচ্ছে, রাজামশাই," বলল গঙ্গারাম। "আমি বলি দেখতে দোষটা কী? একবার দেখেই আমি চলে যাব।"

এমন সময় সকলকে অবাক করে দিয়ে রাজার ঘরে পর্দা সরিয়ে এক পরমা সুন্দরী মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

"এ কী সুনয়না!" রাজা অবাক হয়ে বলে উঠলেন।

"যে আমার পাথর এনে দিয়েছে তাকে একবার দেখতে ইচ্ছা হল," বলল রাজকন্যা সুনয়না। "এই পাথর যে হাতছাড়া করতে পারে সে ত যেমন তেমন

লোক নয়। এমন পয়া পাথর ত আর হয় না। এতে মানুষের ভাগ্য ফিরে যায়।"

গঙ্গারাম অবাক হয়ে রাজকন্যার দিকে চেয়ে বলল, "এ কথা বোধহয় ঠিকই, কারণ এটা পাবার পর থেকেই আমার মতো গরিবের কপালও খুলে গিয়েছিল। এখন যখন পাথরটা চলে গেল—"

"তখন আবার যেইকে সেই হয়ে যাবে তুমি," বলল রাজকন্যা। "আমি এ পাথর ফেরত চাইনি, বাবাই জোর করে ঘোষণা করেছিলেন। আমাদের সত্যি করে কোনো অভাব নেই, অভাব তো তোমারই।"

"অভাবের মধ্যেই ত মানুষ হয়েছি," বলল গঙ্গারাম, "তাই অভাবের অভাবটা যে কী তা জানিই না। তবে একটা কথা বলতে পারি—এই পাথর আমাকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা এনে দিয়েছে। অ্যাদ্দিন বুঝতে পারিনি, আজ বুঝলাম। আমার মনে হয় বাকি জীবনটা তাতে স্বচ্ছন্দে চলে যাবে আমার আর কোনো পাথরের দরকার নেই। ওটা তোমার জিনিস ছিল, তোমার কাছেই থাক।"

"কিন্তু একটা কথা বলি, এই পাথরের গুণে পাওয়া স্বর্ণমুদ্রা এই পাথর চলে গেলে আর নাও থাকতে পারে। তখন তুমি কী করবে?"

"পাথর পাওয়ার আগে যেমনভাবে চলছিল তেমন ভাবেই চলবে।"

"তা কেন? পাথর তো দুজনের কাছেই থাকতে পারে," সকলকে অবাক করে দিয়ে বলল রাজকন্যা।

"এটা ঠিক বলেছ," বলল গঙ্গারাম, "যদি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় তা হলেই ত দুজনের কাছে থাকবে পাথর।"

রাজাকে এবার বাধ্য হয়ে কথা বলতে হল। তিনি গঙ্গারামের দিকে চেয়ে বললেন, "সব ত বুঝলাম। কিন্তু আমি ত আর বেশিদিন নেই, আর আমার কোনও ছেলেও নেই। আমি না থাকলে তুমি রাজকার্য চালাতে পারবে?"

গঙ্গারাম বলল, "অ্যাদ্দিন খেতে লাঙল চালালাম, এখন না হয় রাজ্য চালাব। ফসল ফলানোও ত সহজ কাজ নয়। তাতে অনেক বুদ্ধি লাগে, অনেক পরিশ্রম লাগে। আর রাজকার্যের অর্ধেক কাজ ত করে মন্ত্রী, আপনি আর একা কত করেন রাজামশাই?"

"সে কথা ঠিকই," বললেন রাজামশাই।

"তবে কোনো ভাবনা নেই," বলল গঙ্গারাম। তারপর বলল, "তা হলে

এবার চলি। আপনি এদিকে তোড়জোড় করুন, দিনক্ষণ দেখুন। আমার মামাকে আবার খবরটা দিতে হবে।...চলি রাজকন্যা, আবার পরে দেখা হবে। ভাল কথা—আমার নাম গঙ্গারাম।

দরজার পাশ থেকে রাজকন্যা একটা খুশির হাসি হেসে পর্দা ফেলে দিয়ে চলে গেল।

বাড়ি ফিরে এসেই চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে গঙ্গারাম পাথরের অভাবটা হাড়ে হাড়ে টের পেল। মামার বাতটাও শুনল বেড়েছে। আর সবচেয়ে যেটা অবাক কাণ্ড—খাটের তলা থেকে কলসি বার করে দেখল তার ভিতর রয়েছে শুধু মাটি।

কিন্তু এর কোনোটাই সে গ্রাহ্য করল না, কারণ যা হতে চলেছে, তাতে তার কপাল মন্দ এটা আর বলা চলে না।

রতন আর লক্ষ্মী

॥ ১ ॥

ঠিক কখন থেকে রতনের মনটা খুশিতে ভরে আছে সেটা রতন জানে। দশদিন আগে ছিল চৈত সংক্রান্তি। রতন থাকে শিমুলিতে। সেখান থেকে চার ক্রোশ দূরে উজলপুরে সংক্রান্তির খুব বড় মেলা হয়। রতন গিয়েছিল সেই মেলা দেখতে। শুধু দেখতে নয়, মেলা থেকে বাঁশের বাঁশি কেনার শখও ছিল তার, সেটাও একটা উদ্দেশ্য বটে। রতনের গানের কান খুব ভালো ; যে কোনো গান দুবার শুনলে নিজের গলায় তুলে নিতে পারে। সে বাঁশিও বাজায়, কিন্তু ভালো বাঁশি তার নেই। জমজমাট মেলার এক জায়গায় নানারকম বাজনা বিক্রী হচ্ছিল, তার মধ্যে বাঁশিও ছিল অনেক, রতন তারই কয়েকটা হাতে তুলে ফুঁ দিয়ে দেখছিল, এমন সময় চারদিকে একটা সোরগোল পড়ে গেল। উজলপুরের রাজকন্যা লক্ষ্মী এসেছেন ডুলিতে করে মেলা দেখতে। এমনিতে রাজকন্যারা রাজবাড়ির অন্তঃপুরেই বন্দী থাকে, তাকে বাইরের লোকে দেখতে পায় না। কিন্তু লক্ষ্মী তেমন মেয়ে নয়। সে অনেক আগে থেকেই বাপ-মাকে শাসিয়ে রেখেছে—'সংক্রান্তির মেলা আসছে, আমি কিন্তু তাতে যাব। ওসব পর্দাটর্দা মানতে পারব না। লোকে আমাকে দেখলে ক্ষতি কী ? তারাও মানুষ, আমিও মানুষ ; আর তারা ত আমায় খেয়ে ফেলবে না। আমি ডুলিতে করে যাব। আমার কেষ্টনগরের মাটির পুতুলের খুব শখ ; সেই পুতুল আমি নিজে দেখে কিনতে চাই। তোমরা না করতে পারবে না।' লক্ষ্মী বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান, তাই তার আবদার না রেখে উপায় নেই।

হবি ত হ, বাজনার দোকান মাটির পুতুলের দোকানের ঠিক পাশেই। রতন সবে একটা বাঁশিতে একটা মন-মাতানো সুর তুলেছে এমন সময়

সোরগোল শুনে পাশ ফিরে দেখে রাজকন্যা। শুধু দেখা নয়, একেবারে চোখে চোখে দেখা। রাজকন্যার বয়স ষোলো, রতনের উনিশ। রতনের চেহারাটাও ভালো। সে ব্রাহ্মণ পুরুতের একমাত্র ছেলে। পাঁচ ঘর যজমান নিয়ে পুরুত হরিনারায়ণের মোটামুটি চলে যায়, কিন্তু তার স্ত্রী অন্নপূর্ণা ছেলে রতনকে এই অবস্থার মধ্যেই মানুষ করেছে খুব যত্ন করে। তাই রতনের চেহারায় কোনো দারিদ্র্যের ছাপ পড়েনি।

রাজকন্যা লক্ষ্মীর চোখে চোখ পড়তেই রতনের মন খুশিতে ভরে উঠল। এমন সুন্দর মেয়ে সে দেখেনি কখনো। আহা, একে যদি গান শোনাতে পারত সে তাহলে কেমন ভালো হত!

অবিশ্যি চোখ পড়তেই রাজকন্যা আবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু তাতে কী হয়? তাকে দেখে রাজকন্যার খারাপ লাগেনি এটা রতন বুঝেছে। আর কী চাই? সেএকটারজায়গায় তিনটে বাঁশি কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরল। সে পুরুতগিরি করবে না, গান-বাজনা নিয়েই থাকবে, এটা সে বাপকে বলে দিয়েছে। তার বিয়ের কথাও বাপ দু-একবার তুলেছেন, তাতে রতন কিছু বলেনি। এবার যদি তোলেন তাহলে রতন বলবে উজলপুরের রাজকন্যার মতো সুন্দরী মেয়ে হলেই সে বিয়ে করবে, নইলে নয়।

আজ ছিল রবিবার। সময়টা দুপুর; রতন সকালে দু'ঘণ্টা বাঁশি বাজানো অভ্যাস করে একবার গিয়েছিল গোপীনাথ মুদির দোকানে। বাড়ি ফিরে এসে দেখে এক জটাজূধারী সন্ন্যাসী তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সন্ন্যাসীর চোখ দুটো লাল, গলায় চারখানা বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা। হাতে চিমটে আর কমণ্ডলু। রতনকে দেখেই বাবাজী হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন, 'সেই চাঁদপুর থেকে আসছি, এখনো যেতে হবে তিন ক্রোশ পথ; তোরা ত ব্রাহ্মণ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমাকে এক ঘটি খাবার জল এনে দে ত দেখি।'

'নিশ্চয়ই; আপনি বসুন।'

রতন তাড়াতাড়ি বাবাজীর জন্য দাওয়ায় আসন পেতে দিল। তারপর বাড়ির ভিতরে গেল জল আনতে। মা শুনে বললেন, 'শুধু জল কেন? অতিথি এসেছেন, পিঠে আছে, দু খানা দিয়ে দে জলের সঙ্গে।'

আসলে বাবাজীর চেহারাটা—বিশেষ করে জবা ফুলের মতো চোখ দুটো—রতনের খুব ভালো লাগেনি। তাই মা-র কথা শুনে সে বলল, 'আবার পিঠে কেন? চেয়েছেন ত শুধু জল।'

অন্নপূর্ণা ধমকের সুরে বললেন, 'অতিথিসেবায় যত পুণ্যি তত আর কিছুতে হয় না, জানিস? যা বলছি তাই কর।'

রতন অনিচ্ছা সত্ত্বেও জলের সঙ্গে রেকাবিতে করে পিঠে নিয়ে গিয়ে বাবাজীকে দিল। বাবাজী দুই গ্রাসে দুটো পিঠে খেয়ে ঢক্ ঢক্ করে পুরো ঘটি জলটা খেয়ে ফেলে বললেন, 'আঃ, বড় তৃপ্তি হল!'

কথাটা বলে আরো আরাম করে বসে পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তোর নাম ত রতন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

রতন বুঝল বাবাজী যেমন-তেমন লোক নন; ইনি গুনতে জানেন। কিন্তু তাও তাঁকে রতনের ভালো লাগল না। এমনভাবে পা ছড়িয়ে দিলেন কেন? দুপুরটা এখানেই কাটাবেন নাকি?

'তা বাবা রতন', বললেন বাবাজী, 'একটু পা দুটো ডলে দে ত দেখি। এখনো অনেকটা পথ যেতে হবে।'

রতন এটা আশা করে নি। তার কাছে অনুরোধটা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হল।

সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বাবা আবার বললেন, 'কই, একটু পদসেবা কর! তোর পুণ্যি হবে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?'

রতনের মনটা হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল। ইনি যতবড়ই সাধু হন, রতন পরোয়া করে না। এই লোকটার পা টিপে দেবে না। রাজ্যির ধুলোকাদা লেগে আছে পায়ে এতখানি পথ হেঁটে।

সে মাথা নেড়ে বলল, 'না ঠাকুর, আমায় মাপ করবেন। আমি আমার বাবার পা টিপতে পারি, আর কারুর নয়।'

বাবাজী ছড়ানো পাদুটো টেনে নিলেন। রতন দেখল তাঁর চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলে উঠল।

'কী বললি? আবার বল ত!'

রতন আবার বলল। এবার আরো স্পষ্ট করে। তার ভয় কেটে গেছে।

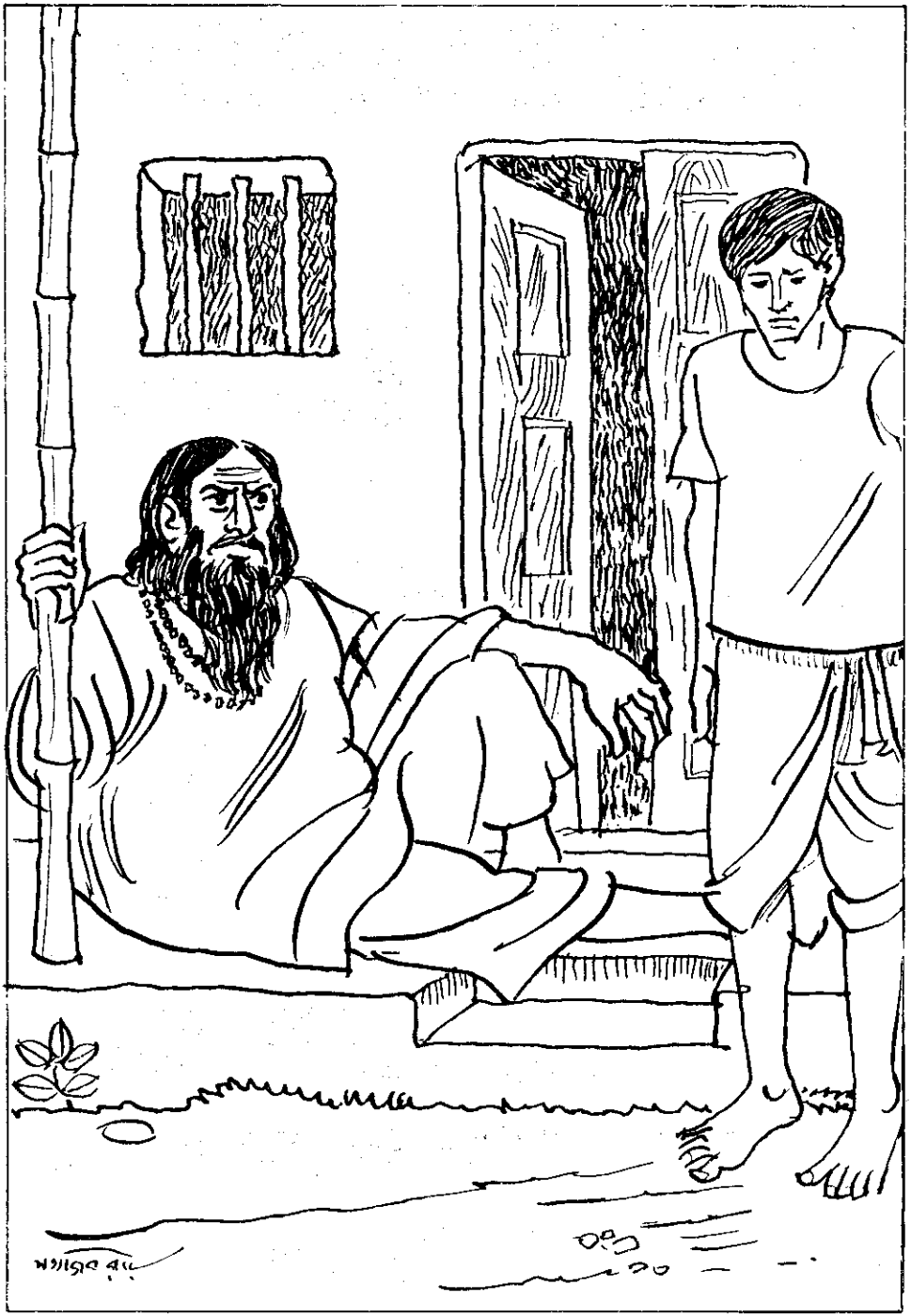

যত বড় সাধুই হোক—কী আর করতে পারে ? এ ত আর দুর্বাসা মুনি নয় যে অভিশাপ দেবে।

'আমি কে জানিস ?' এবার বাবাজী জিগ্যেস করলেন।

রতন চুপ।

'আমি তোর কী করতে পারি জানিস ?' বাবাজী আবার জিগ্যেস করলেন। 'তোর ভবিষ্যৎ আমার হাতের মুঠোয়। আমি বিপুলানন্দ তান্ত্রিক। আমি ত্রিকালজ্ঞ। আমার তেজে চরাচর ভস্ম হয়ে যায়। আমাকে অপমান করার সাহস হল তোর ?'

রতন এখনও চুপ। সে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে বাবাজীর দিকে। বুকে সামান্য দুরু দুরু ভাব। কী করবে তাকে বাবাজী ? কী করতে পারে একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে ?

কিন্তু বাবাজী যে মানুষের বাড়া সে কথা রতন জানবে কি করে ?

'আজ অমাবস্যা', বলে চললেন বাবাজী। 'আজ সায়াহ্নে তুই আর মানুষ থাকবি না। তুই হয়ে যাবি রাক্ষস। আয়তনে তিন গুণ বেড়ে যাবি তুই। সভ্য সমাজে থাকা আর চলবে না তোর। তোর খাদ্য হবে বন্য পশু। আমার পদসেবা করলে তোর মঙ্গলই হত। তাতে যখন তোর এত আপত্তি তখন তোর একটু শিক্ষা হওয়াই দরকার। আমি আসি।'

বাবাজী চিমটে কমণ্ডলু নিয়ে উঠে পড়লেন। রতন পাথর। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। হ্যাঁ, একটা পন্থা আছে। নরহরি খুড়োর কাছে যাওয়া। সায়াহ্ন মানে কখন ? সূর্যি ডোবার আগে ত নয়। তার মানে সময় আছে অন্তত তিন ঘণ্টা।

বাবাজী 'ব্যোম ভোলানাথ' বলে চলে গেলেন।

রতন তাঁকে বেশ কিছুদূর যেতে দিয়ে এক ছুটে গিয়ে পৌঁছাল নরহরি জ্যোতিষীর বাড়ি।

'কী রে রত্না—এই অসময়ে ? কী ব্যাপার ?'

'খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি নরহরি খুড়ো !'

'কী বিপদ ?'

'সেটা আর খুলে বলা যাবে না। আপনি একটু গুনে যদি বলেন আমার সামনের কটা দিন কেমন যাবে !'

রতনের গানের গলা আর মিষ্টি স্বভাবের জন্য গাঁয়ের সকলেই তাকে স্নেহ করে। নরহরি জ্যোতিষী এমনিতে একটু খিটখিটে মানুষ, কিন্তু রতনের দিশাহারা ভাব দেখে তার অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না।

'দাঁড়া দেখি। তোর করকোষ্ঠী আমিই করেছিলাম, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কর্কট রাশি, কৃষ্ণ পক্ষ...হুঁ...'

নরহরি জ্যোতিষী কাগজে কিছুক্ষণ হিজিবিজি কাটলেন, তারপর হঠাৎ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে রতনের দিকে চেয়ে বললেন, 'এ যে মহাসংকট! তোর উপর ত শনির দৃষ্টি পড়েছে দেখছি। সামনের কটা দিন তো ঘোর দুর্বিপাকের সময় রে রতন!'

'কিন্তু তার পরে?' ধরা গলায় জিগ্যেস করল রতন।

নরহরি জ্যোতিষী আবার নকসার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ ভ্রূকুটি করে রইলেন। তারপর তাঁর ঠোঁটের কোনে হাসি দেখা দিল। তিনি তিনবার পর পর 'বাঃ!' বলে বললেন, 'সব মেঘ কেটে যাবে। শনি সরে গিয়ে বৃহস্পতি উঠবে তুঙ্গে। তোর কষ্ট থাকবে না, অভাব থাকবে না, কিচ্ছু থাকবে না।'

'কিন্তু সেটা কদিন পরে নরহরি খুড়ো?'

'বেশি দিন নয়, বেশি দিন নয়। এক পক্ষকাল। আজ অমাবস্যা। পূর্ণিমায় দেখবি মেঘ কেটে গেছে। বুঝেছিস?'

রতন বুঝল।

সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিমে নামতে শুরু করেছে, তাই রতন আর থাকতে পারল না। নরহরি খুড়োর কাছে ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কার করে জেনে নিতে পারলে ভালো হত, কিন্তু তার আর উপায় নেই। মোটামুটি যা জানবার তা রতন জেনে নিয়েছে। কিছুদিনের জন্য তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। অভিশাপের কথা মা-বাবাকে বলবে না। তারপর আবার কপাল ফিরলে সে বাড়ি ফিরবে।

বাড়ি ফিরে এসে রতন দেখল তার বাপও ফিরেছে। বাপ-মা দুজনকেই একসঙ্গে পেয়ে রতন বলল তাকে দু হপ্তার জন্য নারানপুর যেতে হচ্ছে। সেখানে এক নাম-করা গাইয়ে এসেছেন, তাঁর কাছ থেকে যদি কিছু শেখা যায় তার চেষ্টা দেখবে রতন।

ছেলের যে গানের নেশা এটা তার বাপ-মা দুজনেই জানে। কাজেই তাকে এ ব্যাপারে নিরস্ত করার চেষ্টা বৃথা। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুজনকে মত দিতে হল। রতন লাঠির আগায় একটা পোঁটলা বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

গাঁয়ের পশ্চিমপ্রান্তে ঝলসির বন, সেটা পেরোলেই দিগ্‌নগর। ঝলসির বনে রতন গেছে একবারই, কারণ সেখানে অনেক জানোয়ারের বাস। প্রায় তিনশ বছর আগে ঝলসি ছিল এক সমৃদ্ধ শহর ; তখন তার নাম ছিল আজিনগড়। এই আজিনগড়ের ভাঙা কেল্লা দেখতেই রতন গিয়েছিল তার দুই বন্ধু সুবল আর মুকুন্দর সঙ্গে। বিশাল কেল্লা, কিন্তু তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। সাপ-বিচ্ছুর বাস বলে আর ভিতরে কেউ যায় না, আর রতন সেখানেই থাকবে বলে মনস্থির করেছে। একটা ডেরা তার চাই ; লোকের কাছ থেকে গা ঢাকা দিতে হবে ত !

রতন বনের ধারে গিয়ে একটা ছোট নদী থেকে আঁজলা করে জল নিয়ে খেল। অনেকখানি পথ, বেশ জল পিপাসা পেয়েছিল। এখনও সূর্য ডুবতে এক ঘণ্টা দেরি। বাবাজীর কথা যদি ফলেই যায়, তাহলেই সে কেল্লায় গিয়ে ঢুকবে। না হলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বাড়ি ফিরে যাবে : বলবে, ওস্তাদ ছাত্র নিতে নারাজ তাই সে বাড়ি ফিরে এল।

কিন্তু রতনের মন বলছে বাবাজীর কথা ফলবে ; কারণ এর মধ্যেই তার শরীরের ভিতরে কতকগুলো লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছে। হাড়ে কেমন যেন টান টান ভাব। সঙ্গে পোঁটলায় চিড়ে বাঁধা ছিল, কিন্তু সেটা আর খেতে ইচ্ছা করছে না ; অথচ একটা খিদের ভাব রয়েছে, কিন্তু তার জন্য যেন চাই অন্য খাদ্য।

বনের মধ্যে ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসছে। সূর্য এখন দূরের গাছপালার ঠিক মাথার উপর নেমে এসেছে। রতন তার নিজের হাত-পায়ের দিকে চেয়ে দেখল। এত লোম ত তার ছিল না !

আর নখও ত এত ধারালো ছিল না !

সামনে একটা শুয়োর। দাঁতালো বুনো শুয়োর। বন থেকে বেরিয়ে একটা খোলা জায়গায় এসে তার দিকে চেয়ে দেখছে একদৃষ্টে।

রতন একটা আমলকি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল। গাছের ডাল ছিল তার মাথার চেয়ে প্রায় দশ হাত উপরে। হঠাৎ রতন বুঝল ডালটা যেন ক্রমে কাছে

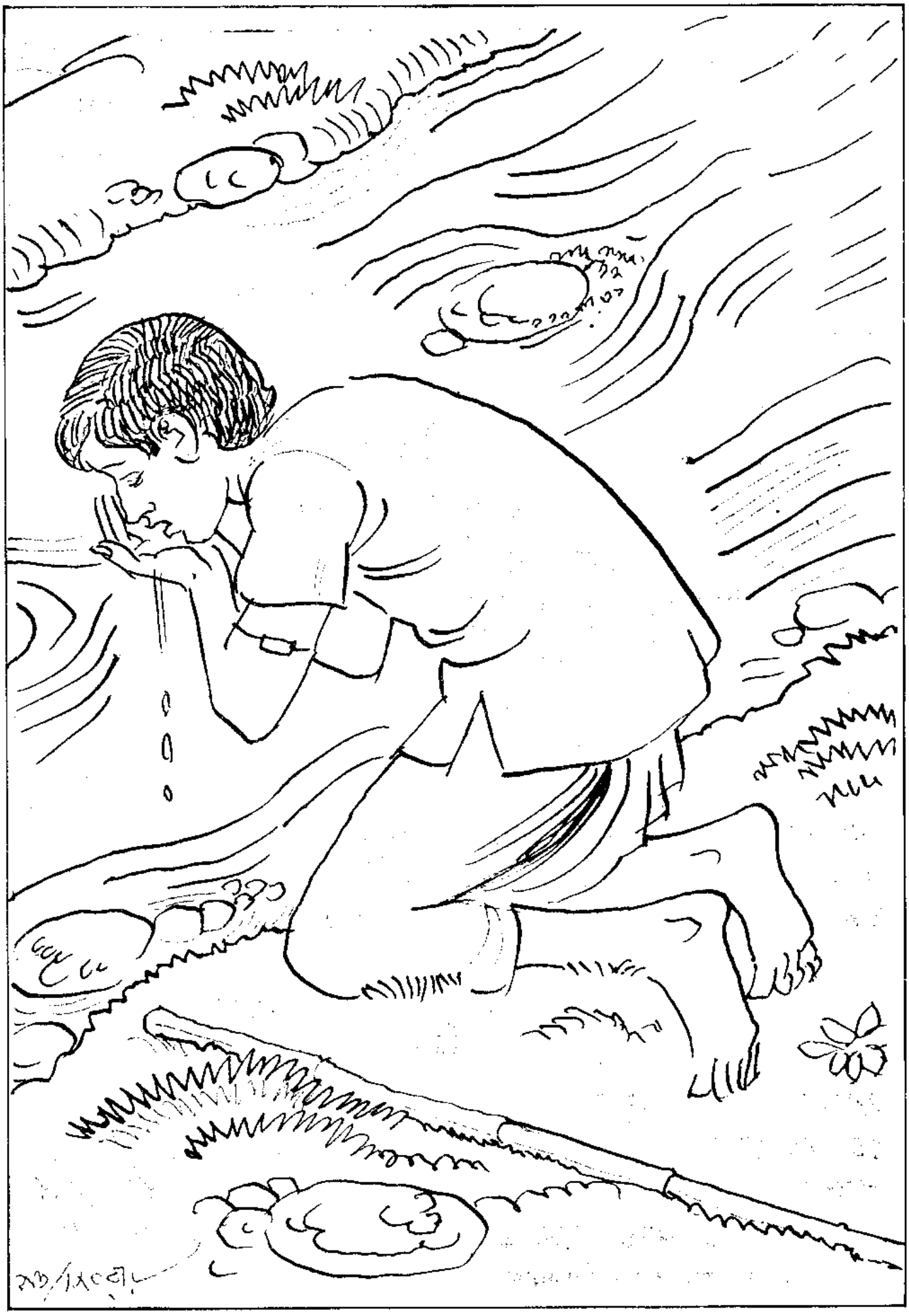

এগিয়ে আসছে।

শুয়োরটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। রতনের দিকে চেয়ে একটা চাপা গর্জনের মতা শব্দ করল। তারপর উল্টো দিকে ঘুরে ছুটে পালাল।

রতন দেখল যে তার মাথা আমলকি গাছের ডাল ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে। তার মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু গালে হাত দিয়ে বুঝল সেখানেও লোম।

এবার রতন বড় বড় পা ফেলে জঙ্গল ভেদ করে রওনা দিল আজিনগড়ের কেল্লার উদ্দেশে।

॥ ২ ॥

আজিনগড়ের কেল্লায় যে একটা রাক্ষস এসে বাস করছে সে খবর শিমুলির লোকে শুনেছে রামদাস কাঠুরের কাছ থেকে। রামদাস কাঠ কাটতে গিয়েছিল ঝলসির বনে। দিনের আলো থাকতে থাকতেই গিয়েছিল যাতে বাঘের খপ্পরে না পড়তে হয়। কেল্লার কাছাকাছি এসে একটা বারো হাত উঁচু দু-পেয়ে প্রাণী দেখতে পেয়ে সে চম্পট দেয়। প্রাণীটার সর্বাঙ্গে লোম, হাতপায়ের নখ বড় বড়, দু পাশের দাঁতগুলো জানোয়ারের মতো ছুঁচোল আর বড়, চোখ দুটো লাল, আর মাথা ভর্তি জটপাকানো চুল।

রামদাস এই বর্ণনা দেবার পর থেকে ঝলসির বনের ধারেকাছে আর কেউ যায় না। এই দানবের ভয়ে সারা শিমুলি গাঁ কাঁপতে শুরু করেছে, যদিও এটাও ঠিক যে মানুষের কোনো অনিষ্ট এই রাক্ষস এখন অবধি করে নি।

রতনের মনটা এখনো আগের মতোই রয়েছে, এমন কি তার গলার আওয়াজেও কোনো পরিবর্তন হয় নি, কেবল তার চেহারা আর খিদেটা গেছে বদলে। বনে ফলমূলের অভাব নেই, কিন্তু রতনের ক্ষিদে মিটতে লাগে বন্য জানোয়ারের কাঁচা মাংস। তার দেহে শক্তিও হয়েছে অমানুষিক ; সে দুই হাতে ধরে যে-কোনো জানোয়ারের ঘাড় মটকে দিতে পারে, তারপর তার ধারালো আর শক্ত দাঁত দিয়ে সেই জানোয়ারের মাংস চিবিয়ে খেতে পারে। তার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি আর ঘ্রাণশক্তি—তিনটেই অসম্ভব বেড়ে গেছে। বাঘ বন দিয়ে হেঁটে চলে নিঃশব্দে, কিন্তু রতনের কানে তার পায়ের শব্দ ধরা

পড়ে। একশো হাত দূর থেকে জানোয়ারের গন্ধ সে পায়, আর পেয়ে নিঃশব্দে তাকে ধাওয়া করে। একবার একটা পুকুরের জলে রতন নিজের চেহারাটা দেখেছিল। দেখে তার নিজেরই ভয় লেগেছিল। জানোয়াররাও তাই তাকে দেখে পালায়, রতনকে ঝড়ের বেগে দৌড়ে গিয়ে তাদের ধরতে হয়।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর একা ভাঙা কেল্লায় বসে তার সবচেয়ে যার কথাটা বেশি মনে হয় সে হল উজলপুরের রাজকন্যা লক্ষ্মী। সংক্রান্তির মেলায় দেখা তার মুখের সেই হাসির কথা ভেবেই রতনের গলায় গান এসে পড়ে, আর সে আশ্চর্য হয়ে দেখে যে রাক্ষস হয়েও তার গানের গলা নষ্ট হয় নি। কিন্তু তা হলে কী হবে ;সে জানে যে সে আর কোনোদিন রাজকন্যার কাছেও যেতে পারবে না, মানুষ হয়েও না। গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে রাজকন্যার কথা ভেবে কী লাভ ? তার জন্য কত রাজপুত্র রয়েছে, তাদের একটার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যাবে আর কিছুদিনের মধ্যেই।

তখনই আবার তার নরহরিখুড়োর কথাটা মনে পড়ে। তার কপাল যে ফিরবে সেটা কোনদিকে ? হঠাৎ কি সে বড়লোক হয়ে উঠবে যাতে তার আর কোনো অভাব থাকে না ? রাজারাজড়া ত সে আর হতে পারবে না, তাহলে নরহরিখুড়োর কথার মানেটা কী ? খুড়োর ত বয়স হয়েছে অনেক ; তার গণনায় ভুল হয়নি ত ?

দশদিনে কাছাকাছির মধ্যে যা জানোয়ার ছিল সব শেষ করে রতন চলল দিগনগরের দিকে। দিগনগরের পশ্চিমে ঝলসির লাগোয়া বন শহরকে তিন দিক দিয়ে ঘিরে রয়েছে। এই বনের নাম কী রতন জানে না, কিন্তু এখানে জানোয়ার আছে অনেক, রাজা মৃগয়ায় আসেন, এ খবর রতন রাখে। অনেক দূর পথ হেঁটে রতনের ক্ষিদে পেয়েছিল খুব, তাই বাঘের গন্ধ পেয়ে সে সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়েছিল, আর গাছপালার ফাঁক দিয়ে সে বাঘকে দেখতেও পেল। কিন্তু সেটার দিকে এগোতে গিয়েই হঠাৎ দেখল একটা তীর এসে বাঘের গায়ে লাগাতে সেটা ছট্‌ফট্ করে মরে গেল। তারপরেই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেয়ে রতন একটা সেগুন গাছের আড়ালে লুকোবার আগেই তাকে দেখে ফেলল ঘোড়সওয়ার। পোষাক দেখেই বোঝা যায় সে রাজপুত্র। মৃগয়ায় বেরিয়েছে। এদিকে রাজপুত্র এমন বিশাল এক রাক্ষসের

সামনে পড়ে থতমত। যদিও রতন দেখে আশ্চর্য হল যে রাজপুত্র ডরায়নি।

'তুমিই বুঝি ঝলসির বনের রাক্ষস?' রাজকুমার জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ', বলল রতন। 'কিন্তু তুমি কে?'

'আমি চন্দ্রসেন। দিগ্‌নগরের রাজকুমার।' তারপর একটু অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু তুমি ত ঠিক মানুষের মতো কথা বল দেখছি।'

'তার কারণ আমি আসলে মানুষ,' বলল রতন। 'এক সন্ন্যাসীর অভিশাপে আমি রাক্ষস হয়েছি। তোমার আমাকে দেখে ভয় করছে না?'

'কই, না ত। তুমি ত আর মানুষ ধরে খাও না; ভয় করবে কেন?'

'কিন্তু আমি ত জানোয়ার খাই। এই বাঘটাকে আমি খাবো বলে ঠিক করেছিলাম, সেটাকে তুমি মারলে।'

'আমি মারলাম তাতে কী হল? আমি আজ অনেক শিকার পেয়েছি। এখন সন্ধ্যা হতে চলল, এবার ফিরব। এই বাঘটা তুমিই খাও।'

'তুমি কি একাই শিকার কর?' রতন অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ। আগে লোকজন নিয়ে করতাম, এখন একাই করি। আমার ভয় করে না। ভালো কথা, তোমার একটা নাম আছে ত, না কী?'

'হ্যাঁ। আমার মানুষ নাম রতন। এখন আমি রাক্ষস, তাই সে নামের আর কোনো দাম নেই।'

'তুমি কি এখন এই বনেই থাকবে?'

'যদি খাবার পাই তাহলে থাকব।'

'তাহলে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে। কাল আমি থাকব না। কাল যাব উজলপুর।'

উজলপুর শুনেই রতনের চমক লাগল।

'কেন? উজলপুরে কী?'

'সেখানে ডম্বরি পাহাড়ের গুহায় একটা দানব এসে রয়েছে। সে মানুষ খায়। তাকে মারবার জন্য উজলপুরের রাজা ঢ্যাঁড়া দিয়েছেন। আমি গিয়ে দেখব সেটাকে যদি মারতে পারি।'

চন্দ্রসেন বিদায় নিয়ে চলে গেল। রতনের খুব ভালো লাগল রাজকুমারকে। কিন্তু উজলপুরে দানবের ব্যাপারটা শুনে রতন যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। মানুষখেকো দানব। চন্দ্রসেন যাবে তাকে মারতে।

পারবে ত ?

পরদিন সকাল থেকে রতন দেখল তার মন বারবার চলে যাচ্ছে উজলপুরের দিকে। একে ত সেখানেই থাকে লক্ষ্মী রাজকন্যা, তার উপর তার রাজ্যে বিপদ দেখা দিয়েছে, মানুষখেকো দানবের আবির্ভাব হয়েছে। উজলপুরের কেউ নিশ্চয়ই সে দানবকে মারতে পারেনি, নইলে আর ঢ্যাঁড়া দেবে কেন ? মারতে পারলে কোনো পুরস্কার দেবে কি রাজা ? সে কথা ত চন্দ্রসেন কিছুই বলল না।

রতন আর চিন্তা না করে বনের ভিতর দিয়ে উজলপুর রওনা দিল। এখান থেকে দুক্রোশের বেশি দূর হবে না। সকালে সে একটা বুনো শুয়োর খেয়ে নিয়ে লম্বা পাড়ি দেবার জন্য তৈরি হয়ে নিয়েছে। চন্দ্রসেনের জন্য তার মনে একটা চিন্তা দেখা দিয়েছে। জানোয়ার মারা আর দানব মারা এক জিনিস নয়।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই রতন ডম্বরি পাহাড়ের কাছে পৌঁছে গেল। পাহাড়ের চারিদিকে ঘিরে আছে ঘন বন। সেই বন ধরে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড গুহা দেখতে পেল রতন। এটাই কি দানবের গুহা ? হ্যাঁ, এটাই, কারণ তার প্রখর দৃষ্টিশক্তির জোরে সে দেখতে পেয়েছে যে গুহাটার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে আছে অনেক মানুষের হাড়।

রতন একটা বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কান তাকে বলল যে ঘোড়ার খুরের শব্দ এগিয়ে আসছে।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছে রতন। একটা ঘোড়া নয়, অনেক ঘোড়া। তবে একটা ছাড়া আর সবগুলোই একটা জায়গাতেই এসে থেমে গেল। তাদের পিঠে রয়েছে বল্লমধারী সৈন্য। আর, যে ঘোড়াটা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল তার পিঠে আছে রাজকুমার চন্দ্রসেন।

রাজকুমার নির্ভয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে উঠে গেল দানবের গুহা লক্ষ করে। গুহার মুখে এসে ঘোড়া থামাল সে। এবার সেনারা দামামা বাজিয়ে জানান দিল যে রাজকুমার উপস্থিত। এই শব্দেই দানবের বাইরে বেরোন উচিত ; এবার তার রাজকুমারের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

রতনকে আর অপেক্ষা করতে হল না। দামামা বাজানোর প্রায় সঙ্গে

সঙ্গেই একটা বিকট হুঙ্কার দিয়ে দানব এক লাফে গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে এল—তার পায়ের চাপে কিছু বড় পাথর পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের দিকে গড়িয়ে এল সশব্দে।

দানবটা যে কত বড় সেটা ঘোড়ার পিঠে রাজকুমারের পাশে তাকে দেখে বোঝা গেল। রতন প্রমাদ গুণল। চন্দ্রসেন বিদ্যুৎ বেগে তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে দানবের দিকে, কিন্তু সে তীর দানবের পুরু চামড়া ভেদ করতে না পেরে চতুর্দিকে ছিটকে পড়ছে।

দানব যেন এটা উপভোগই করছে এমন ভাব করে কিছুক্ষণ বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আরেকটা হুঙ্কার দিয়ে সে ঘোড়ার পিঠে চন্দ্রসেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ঠিক এই মুহূর্তেই রতন বুঝল যে তার আর চুপ করে থাকা চলে না। সে বটগাছের পাশ থেকে বেরিয়ে কয়েকটা বিশাল লাফ দিয়ে পাহাড় বেয়ে পৌঁছে গেল দানবের পাশে। দানব তখন দুহাত দিয়ে ঘোড়া সমেত চন্দ্রসেনকে জাপটে ধরেছে, চন্দ্রসেনও ছটফট করছে এই নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার জন্য। এমন সময় এই নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে পেয়ে দানব হঠাৎ হতভম্ব হয়ে ঘোড়াকে ছেড়ে দিল। তারপরেই সে ধেয়ে এল রতনের দিকে।

কিন্তু রতনের খাদ্য বন্য পশু আর দানবের খাদ্য মানুষ;দানব এই রাক্ষসের সঙ্গে পারবে কেন ? দানবকে দুহাতে জাপটে নিয়ে তাকে মাথার উপর তুলে রতন প্রথম বুঝল তার নিজের শরীরে কত শক্তি হয়েছে। সেই অবস্থা থেকে সে পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকাণ্ড পাথরের উপর দানবকে আছড়ে ফেলল। দানবের জানও কম কড়া নয় ; সে সেই অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে উঠে আবার রতনের দিকে ধেয়ে এল। রতন আবার তাকে দুহাতে জড়িয়ে এবার আর ছুঁড়ে না ফেলে শুধু চাপের জোরে তাকে শেষ করার চেষ্টা করল।

সে চাপ যেন সহস্র অজগরের চাপ। দানব হাত পা ছুঁড়তে চেষ্টা করেও পারল না। তার চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে। তার মুখ হাঁ করে জিভ বেরিয়ে গেছে, আর সেই মুখের মধ্যে দিয়ে রতনের চাপের চোটে দানবের শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে এল। এবার রতন হাত আলগা দিতেই দানবের নিষ্প্রাণ দেহ পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে একেবারে নীচে গিয়ে পড়ল।

এমন সময় কোলাহল শোনা গেল। সৈন্যদের কোলাহল। উজলপুরেও

ঝলসির বনের রাক্ষসের খবর পৌঁছে গেছিল, এখন সেই রাক্ষস এখানে হাজির দেখে একশো সেনা তাদের বল্লম উঁচিয়ে ধেয়ে এল রতনের দিকে।

এইবারে দুটো ব্যাপার ঘটল : রতন কোনোরকম আক্রোশ দেখাল না। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল গুহার সামনে। আর চন্দ্রসেন সৈন্যদের দিকে হাত তুলে বলল,'এ রাক্ষসই হোক আর যাই হোক, এ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, আর দানবের সংহার এ-ই করেছে ; আমার দ্বারা এ কাজ হত না। কাজেই একে তোমরা রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাও ; দেখো যেন এর অনিষ্ট না হয়।'

রতনকে নিয়ে সৈন্যদের কোনো বেগই পেতে হল না ; তারা তাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে চলল, আর রতনও সে ব্যাপারে কোনো আপত্তি করল না।

রাজপ্রাসাদের কয়েদখানা রতনের পক্ষে যথেষ্ট বড় নয় বলে তাকে প্রাসাদের পিছনে একটা অশ্বত্থ গাছের সঙ্গে চারগাছা দড়ি দিয়ে বেঁধে দশ জন সশস্ত্র প্রহরী পাহারা রেখে দেওয়া হল।

এবার রাজা নিজে এলেন রাক্ষসকে দেখতে। বন্য পশু খেয়ে রাক্ষস যে এমন শান্তশিষ্ট হতে পারে এটা রাজা ভাবতেই পারেননি।

আর আরেকজন তাকে দেখল প্রাসাদের দোতলার একটা জানালা থেকে, সে হল রাজকন্যা লক্ষ্মী। এমন কদাকার বিশাল একটা প্রাণী এমন নিরীহ ভাবে বসে থাকতে পারে তাদের দেশের এত বড় একটা শত্রুর প্রাণ সংহার করে, এটা লক্ষ্মীর কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। এ কি সত্যিই রাক্ষস, না অন্য কিছু ?

ক্রমে দিন ফুরিয়ে রাত এসে পড়ল। রতন এতই নির্জীব হয়ে পড়েছিল যে পেয়াদারা তাদের কাজে একটু একটু ঢিলে দিয়ে কেউ কেউ ঘুমিয়েই পড়েছিল। রতনের তাতে তাপ-উত্তাপ নেই ; সে শুধু একজনের মন পাবার আশায় বসে আছে। এমন চেহারা নিয়ে যদিও সে আশা দুরাশা, কিন্তু রতন তবুও হাল ছাড়তে পারে না।

আকাশে চাঁদ দেখে, রাজবাড়ির বাগান থেকে ফুলের গন্ধ পেয়ে রতনের মনে একটা উদাস ভাব এল। চারিদিক নিঝুম হয়ে আছে। তার মধ্যেই রতনের মাথায় একটা গানের কলি এল। তার পরেই সেই গান তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল। প্রহরীদের মধ্যে যারা জেগে ছিল তারা অবাক হয়ে

রাক্ষসের দিকে চাইল। এই রাক্ষস গান গায় ? আর এত সুন্দর গলায় ?

রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে সে গান ভেসে পৌঁছে গেল রাজবাড়ির দোতলার অন্তঃপুরে। আর সবাই ঘুমে অচেতন, কেবল একজন জেগে আছে তার রেশমের বালিশে মাথা দিয়ে। রাজকুমারী লক্ষ্মী।

গানের কলি তার কানে যেতেই লক্ষ্মী চমকে উঠে মোহিত হয়ে গেল। এই সুরই ত সেই ছেলেটি বাঁশিতে বাজিয়েছিল সংক্রান্তির মেলায় ! এটা কী করে হয় ?

তারপর রাজকন্যার মনে পড়ল ঘোষণার কথা। উজলপুরের রাজার ঘোষণা দেশে দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এ কদিনের মধ্যে।—'যে এই দানবকে মারতে পারবে সে পাবে অর্ধেক রাজত্ব, আর সেই সঙ্গে রাজকন্যাকে।' এই রাক্ষসই ত সেই দানবকে মেরেছে !

একি সত্যিই রাক্ষস ?

এদিকে রতন গান গেয়েই চলেছে। রাজকন্যা লক্ষ্মীর চোখে ঘুম নেই। তার মাথায় অদ্ভুত সব চিন্তা এসে জড়ো হয়েছে। কাল সকালে সে বাবার সঙ্গে দেখা করবে। তার মন বলছে—

না, এখনও কিছু বলছে না তার মন, কিন্তু তার মাথার মধ্যে সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে। সে এই রহস্যের কোনো কিনারা করতে পারছে না।

শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীর চোখে ঘুম এল, আর ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখল সেই রাক্ষস তাকে বলছে, 'তুমি হ্যাঁ বললেই আমার এ দশার শেষ হবে। তাছাড়া আমার মুক্তি নেই।'

পরদিন সকালে লক্ষ্মী তার বাবাকে ডেকে পাঠাল। রাজা তখন সবে নদীতে স্নান সেরে ফিরছেন। তিনি এসে বললেন, 'কী বলছ মা ?'

লক্ষ্মী সোজা বাপের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি একবার রাক্ষসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কেন মা ? এমন ইচ্ছা কেন হল তোমার ?'

'তুমি বলেছিলে, যে দানবকে মারবে তাকেই তুমি তোমার মেয়েকে আর অর্ধেক রাজত্ব দেবে। তুমি ত বলনি যে সে যদি রাক্ষস হয় তাহলে দেবে না।'

'একি পাগলের মতো কথা বলছ তুমি ? রাক্ষসের হাতে তুলে দেব

তোমাকে আর অর্ধেক রাজত্ব ?'

'কেন দেবে না ? সে ত কোনো দোষ করে নি। তার চেহারাটাই যা খারাপ। কাল রাত্রে তার গান শুনেছি আমি। এমন আশ্চর্য সুন্দর গলা খুব কম মানুষের হয়।'

'তুমি ত মহা সমস্যায় ফেললে দেখছি !'

'না বাবা। আমি ওকেই বিয়ে করব। একবার আমাকে ওর কাছে নিয়ে চল।'

'যদি সে কিছু করে ?'

'কিছু করবে না। আমার মন বলছে কিছু করবে না।

অগত্যা রাজা লক্ষ্মীকে নিয়ে গেলেন রাক্ষসের কাছে। আর সেখানে গিয়ে দেখলেন এক আশ্চর্য দৃশ্য।

এই সবে এক পক্ষকাল শেষ হল ; আজ পূর্ণিমা। তাই রাক্ষসের গা থেকে লোম মিলিয়ে যাচ্ছে। তার নখ ছোট হয়ে যাচ্ছে, আর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছোট হয়ে গিয়ে স্বাভাবিক মানুষের আকার নিচ্ছে, আর এ মানুষকে লক্ষ্মী চেনে।

সংক্রান্তির মেলায় একে দেখেছিল তার দিকে চেয়ে হাসতে।

আর এখন সেই হাসিই লেগে আছে রতনের ঠোঁটের কোণে।

রতন উঠে দাঁড়াল। তারপর মুখ খুলল। বলল, 'আমার নাম রতন।'

'আর আমার নাম লক্ষ্মী', বলল রাজকন্যা।

'শোন রতন', বললেন রাজা, 'আমি কথা দিয়েছি যে, যে দানবকে মারবে তাকে আমার অর্ধেক রাজত্ব, আর আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব।'

'সে ত ভালো কথা,' বলল রতন।

'কিন্তু তোমার এমন দশা হল কী করে ?' জিগ্যেস করল রাজকন্যা লক্ষ্মী।

রতন হাসল। তারপর বলল, 'সব বলব, আগে মণ্ডা মিঠাই আন ; বড় খিদে পেয়েছে।'

কানাইয়ের কথা

॥ ১ ॥

নসু কবরেজ প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে বলরামের নাড়ী ধরে বসে রইলেন। শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে বলরামের সতের বছরের ছেলে কানাই কবরেজের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। আজ দশ দিন হল তার বাপের অসুখ। কোনো কিছু খাবারে তার রুচি নেই ; এক টানা দশ দিন না খেয়ে সে শুকিয়ে গেছে, তার চোখ কোটরে বসে গেছে, তার সর্বাঙ্গ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তিন ক্রোশ পায়ে হেঁটে কানাই নসু কবরেজের কাছে গিয়ে তাঁর হাতে পায়ে ধরে তাঁকে নিয়ে এসেছে তার বাপের চিকিৎসার জন্য। এ রোগের নাম কী তা কানাই জানে না। কবরেজ জানেন কি ? তাঁর চোখের ভ্রূকুটি দেখে কেমন যেন সন্দেহ হয়। মোট কথা এ যাত্রা তার বাপ না বাঁচলে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে। আপন লোক বলতে তার আর কেউ নেই। নন্দীগ্রামে দু বিঘে জমি আর একজোড়া হাল বলদ নিয়ে থাকে বাপ-ব্যাটায়। ক্ষেতে যা ফসল হয় তাতে মোটামুটি দুবেলা দু মুঠো খেয়ে চলে যায় দুজনের। কানাইয়ের মা বসন্ত রোগে মারা গেছেন বছর পাঁচেক আগে, আর এখন বাপের এই বিদ্‌ঘুটে ব্যারাম।

'চাঁদনি', নাড়ী ছেড়ে মাথা নেড়ে বললেন কবরেজ মশাই। নসু কবরেজের খ্যাতি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। তাঁর নাড়ী জ্ঞান নাকি যেমন-তেমন নয়। তিনি জবাব দিয়ে গেলে রোগীকে বাঁচানো শিবের অসাধ্যি, আর তিনি ওষুধ বাতলে গেলে রোগী চাঙ্গা হয়ে উঠবেই। কিন্তু চাঁদনি আবার কী ? 'আজ্ঞে ?' ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল কানাই।

'চাঁদনি পাতার রস খাওয়াতে হবে, তাহলেই রোগ সারবে। সংস্কৃত নাম

চন্দ্রায়ণী। আর রোগের নাম হল শুখ্‌নাই।'

'চাঁদনি একটা গাছের নাম বুঝি ?' ঢোক গিলে জিগ্যেস করল কানাই।

নসু কবরেজ ওপর নীচে মাথা নাড়লেন দুবার। কিন্তু তাঁর চোখ থেকে ভ্রূকুটি গেল না।

'কিন্তু চাঁদনি ত যেখানে সেখানে পাবে না বাপু', শেষটায় বললেন তিনি।

'তবে ?'

'বাদড়ার জঙ্গলে যেতে হবে। একটা পোড়ো মন্দির আছে মহাকালের। তার উত্তর দিকে পঁচিশ পা গেলেই দেখবে চাঁদনি গাছ। কিন্তু সে তো প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ ; পারবে যেতে ?'

'নিশ্চয়ই পারব,' বলল কানাই। 'হাঁটতে আমার কোনো কষ্ট হয় না।'

কথাটা বলেই কানাইয়ের আরেকটা প্রশ্ন মাথায় এল।

'কিন্তু গাছ চিনব কি করে কবরেজ মশাই ?'

'ছোট ছোট ছুঁচলো বেগনে পাতা, হলদে ফুল আর মন-মাতানো গন্ধ। বিশ হাত দূর থেকে সে গন্ধ পাওয়া যায়। স্বর্গের পারিজাতকে হার মানায় সে গন্ধ। তিন চার হাতের বেশি উঁচু নয় গাছ। একটি পাতা বেটে রস খাওয়ালেই আর দেখতে হবে না। ব্যারাম বাপ-বাপ বলে পালাবে, আর শরীর দুদিনেই তাজা হয়ে যাবে। তবে সময় আছে আর মাত্র দশ দিন। দশ দিনের মধ্যে না খাওয়ালে...'

নসু কবরেজ আর কথাটা শেষ করলেন না।

'আমি কাল সক্কাল-সক্কাল বেরিয়ে পড়ব, কবরেজ মশাই,' বলল কানাই। 'গণেশ খুড়োকে বলব আমি যখন থাকব না তখন যেন বাবাকে এসে দেখে যায়। খাওয়ানো ত যাবে না বোধ হয় কিছুই ?'

নসু কবরেজ মাথা নাড়লেন। 'সে চেষ্টা বৃথা। এ ব্যারামের লক্ষণই এই। পেটে কিছুই সহ্য হয় না, আর দিনে দিনে শরীর শুকিয়ে যেতে থাকে। তবে চাঁদনির রস এর অব্যর্থ ওষুধ। আর, ইয়ে, ব্যারাম সারবার পর বাকি কথা হবে...'

পড়শী গণেশ সামন্তকে বাপের দিকে একটু নজর রাখার কথা বলে পরদিন ভোর থাকতে গুড়-চিঁড়ে গামছায় বেঁধে নিয়ে কানাই বেরিয়ে পড়ল বাদড়ার জঙ্গলের উদ্দেশে। পৌঁছতে পৌঁছতে সেই বিকেল হয়ে যাবে, কিন্তু কানাই

পরোয়া করে না। বাপকে সে দেবতার মতো ভক্তি করে আর বাপও ছেলেকে ভালোবাসে প্রাণের চেয়েও বেশি। দিব্যি সুস্থ মানুষটার হঠাৎ যে কী হল! —দেখতে দেখতে শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেল।

পথ জানা নেই, তাই একে তাকে জিগ্যেস করে করে চলতে হচ্ছে। বনের নাম শুনে সকলেই জিগ্যেস করে, 'কেন, সেখানে আবার কী?' শুনে কানাই বুঝতে পারে বনটা খুব নিরাপদ নয়, কিন্তু তা হলে কী হবে? বাপের জন্য চাঁদনি পাতা জোগাড় করতে সে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

সূর্যি যখন লম্বা লম্বা ছায়া ফেলতে শুরু করছে তখন একটা ধানক্ষেতের ওপারে কানাই দেখল একটা গভীর বন দেখা যাচ্ছে। ক্ষেত থেকে এক কৃষক কাঁধে লাঙল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। তাকে জিগ্যেস করে কানাই জানল ওটাই বাদড়ার বন। কানাই পা চালিয়ে এগিয়ে চলল।

শাল সেগুন শিমূলের সঙ্গে আরো কত কী গাছ মেশানো ঘন বনে সূর্যের আলো ঢোকে না বললেই চলে। এই বিশাল বনে তিন চার হাত উঁচু গাছ খুঁজে পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? তবে কাছে মন্দির আছে সেই একটা সুবিধে।

বিশ পঁচিশ হাত ভেতরে ঢুকতেই একটা হরিণের পাল দেখতে পেল কানাই। তাকে দেখেই হরিণগুলো ছুটে পালালো। হরিণ ত ভালো, কিন্তু তেমন জাঁদরেল কোনো জানোয়ার যদি সামনে পড়ে? যাই হোক, সে ভেবে কোনো লাভ নেই। তার লক্ষ্য হবে এখন একটাই; প্রথমে মহাকালের মন্দির, তারপর চাঁদনি গাছ খুঁজে বার করা।

মন্দির দেখতে পাবার আগে কিন্তু গন্ধটা পেল কানাই। তত জোরালো নয়; মিহি একটা গন্ধ, কিন্তু তাতেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

এবার একটা মহুয়া গাছ পেরিয়ে পোড়ো মন্দিরটা চোখে পড়ল। দিন ফুরিয়ে এসেছে, তবে মন্দিরের চারপাশটায় গাছ একটু পাতলা বলে পড়ন্ত রোদ এখানে ওখানে ছিটিয়ে পড়েছে।

'তুই কেরে ব্যাটা?'

প্রশ্নটা শুনে কানাই চমকে তিন হাত লাফিয়ে উঠেছিল। এখানে অন্য মানুষ থাকতে পারে এটা তার মাথাতেই আসে নি। এবার মুখ ঘুরিয়ে দেখল একটা গোলপাতার ছাউনির সামনে তিন হাত লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা একটা

אליעזר פוגל

লোক ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে তার দিকে।

'তুই যা খুঁজছিস তা এখানে পাবি না,' এবার বলল বুড়ো কয়েক পা এগিয়ে এসে। সে কি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে নাকি?

'কী খুঁজছি তা তুমি জান?' জিগ্যেস করল কানাই।

'দাঁড়া দাঁড়া, একটু মনে করে দেখি। তোকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু এখন আবার মন থেকে হঠাৎ ফস্‌কে গেল। একশো ছাপ্পান্ন বছর বয়সে স্মরণশক্তি কি আর জোয়ান বয়সের মত কাজ করে?'

বুড়ো মাথা হেঁট করে ডান হাত দিয়ে গাল চুলকে হঠাৎ আবার মাথা সিধে করে বলল, 'মনে পড়েছে। চাঁদনি। তোর বাপের অসুখ, তার জন্য চাঁদনি পাতা নিতে এসেছিস তুই। ওই মন্দিরের উত্তর দিকটায় ছিল আজ দুকুর অবধি। কিন্তু সে ত আর নেই! গিয়ে দেখ—শেকড় অবধি তুলে নিয়ে গেছে।'

কানাইয়ের বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে গেছে। এতটা পরিশ্রম মাঠে মারা যাবে? সে মন্দির লক্ষ করে এগিয়ে গেল। উত্তর দিক। উত্তর দিক কোনটা? হ্যাঁ, এইটে। ওই যে গর্ত। ওইখানে ছিল গাছ—শেকড় অবধি তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু কে?

কানাইয়ের চোখে জল। সে বুড়োর কাছে ফিরে এল।

'কে নিল সে গাছ? কে নিল?'

'রূপসার মন্ত্রী সেপাই-সান্ত্রী নিয়ে এসে গাছ তুলে নিয়ে গেছে। রূপসার প্রজাদের ব্যারাম হয়েছে—শুখ্‌নাই ব্যারাম—বিশদিনে না খেয়ে হাত পা শুকিয়ে মরে যায় তাতে। একমাত্র ওষুধ হল চাঁদনি পাতার রস।'

কানাইয়ের আর কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। সে চোখে অন্ধকার দেখছিল। কিন্তু বুড়ো একটা অদ্ভুত কথা বলল।

'চাঁদনি এখানে নেই বটে, কিন্তু আমি যে দেখছি তোর বাপ ভালো হয়ে উঠবে।'

কানাই চমকে উঠল।

'তাই দেখছেন? সত্যি তাই দেখেছেন? কিন্তু ওষুধ না পেলে কি করে ভালো হবে? এ গাছ আর কোথায় আছে সে আপনি জানেন?'

বুড়ো মাথা নাড়ল। 'আর কোথাও নেই। এই একটি মাত্র জায়গায় ছিল,

তাও এখন চলে গেছে রূপসার রাজ্যে।'

'সে কতদূর এখান থেকে?'

'দাঁড়া, একটু ভেবে দেখি।'

বুড়ো বোধ হয় আবার ভুলে গেছে, তাই মনে করার চেষ্টায় মাথা হেঁট করে টাক চুলকোতে লাগল।

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ত্রিশ ক্রোশ পথ। বিশাল রাজ্য।'

এবার কানাইয়েরও মনে পড়েছে। বলল 'রূপসা মানে যেখানের তাঁতের কাপড়ের খুব নামডাক?'

'ঠিক বলেছিস। রূপসার শাড়ি ধুতি চাদর দেশ-বিদেশে যায়। এমন বাহারের কাপড় আর কোথাও বোনা হয় না।'

'আপনি এত জানলেন কি করে? আপনি কে?'

'আমি ত্রিকালজ্ঞ। আমার নাম একটা আছে। তবে এখন মনে পড়ছে না। ভালো কথা, তোকে ত একবার রূপসা যেতে হচ্ছে। চাঁদনির খোঁজ তোকে করতেই হবে।'

'কিন্তু কবরেজ বলেছে দশ দিনের মধ্যে বাপকে ওষুধ খাওয়াতে না পারলে বাপ আর বাঁচবে না। তার মধ্যে একদিন ত চলেই গেল।'

'তাতে কী হল। যা করতে হবে ঝটপট করে ফেল।'

'কী করে করব? ত্রিশ ক্রোশ পথ। সেখানে যাওয়া আছে, গাছ খুঁজে বার করা আছে, ফেরা আছে···।'

'দাঁড়া, মনে পড়েছে।'

বুড়ো এবার তার কুটিরের মধ্যে ঢুকে একটা থলি বার করে আনল। তারপর তার থেকে তিনটে গোল গোল জিনিস বার করল—একটা লাল, একটা নীল, একটা হলদে।

'এই দ্যাখ', লালটা হাতে তুলে বলল বুড়ো। 'এটা একরকম ফল। এটা খেলে তুই হরিণের চেয়ে তিন গুণ জোরে ছুটতে পারবি। এক ক্রোশ পথ তোর যেতে লাগবে তিন মিনিট। তার মানে দেড় ঘণ্টায় তুই পৌঁছে যাবি রূপসা। এই তিনটেই ফল, আর তিনটেই তোকে দিলাম।'

'কিন্তু হলদে আর নীল ফল খেলে কী হয়?'

'এই ত মুশকিলে ফেললি', বলে বুড়ো আবার মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ

ভাবল। তারপর এপাশ ওপাশ মাথা নাড়িয়ে বলল, 'উঁহু, মনে পড়ছে না। তবে কিছু একটা হয়, আর সেটা তোর উপকারেই লাগবে। যদি কখনো মনে পড়ে তবে তোকে জানাব।'

'কী করে জানাবে? আমি ত চলে যাব।'

'উপায় আছে।'

বুড়ো আবার থলির ভিতর হাত ঢুকিয়ে এবার একটা ঝিনুক বার করল, সেটা প্রায় হাতের তেলোর সমান বড়। সত্যি বলতে কি, কানাই এত বড় ঝিনুক কখনো দেখেনি। ঝিনুকটা কানাইকে দিয়ে বুড়ো বলল, 'এটা সঙ্গে রাখবি। আমার কিছু বলার দরকার হলে আমি তোকে নাম ধরে ডাকব। তোর নাম কানাই ত?'

'হ্যাঁ।'

'সেই ডাক তুই এই ঝিনুকের মধ্যে শুনতে পাবি। ওটা তোর ট্যাঁকে থাকলেও শুনতে পাবি। তারপর ঝিনুকটাকে কানের উপর চেপে ধরলেই তুই পষ্ট আমার কথা শুনতে পাবি। আমার কথা যখন শেষ হবে তখন ঝিনুকে শোনা যাবে সমুদ্রের গর্জন। তখন আবার ঝিনুকটা ট্যাঁকে গুঁজে রাখবি।'

কানাই ঝিনুকটা নিয়ে তার ট্যাঁকেই রাখল। বুড়ো এবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বলল, 'আজ ত সন্ধে হয়ে গেল। তুই এখন রূপসা গিয়ে কিছু করতে পারবি না। আমি বলি আজ রাতটা আমার কুটিরেই থাক, কাল ভোরে রওনা হবি। তাহলে ওখানে সারা দিনটা পাবি, অনেক কাজ হবে। আমার ঘরে ফলমূল আছে, তাই খাবি এখন।'

কানাই রাজি হয়ে গেল। তার ইচ্ছে করছিল তখনই লাল ফলটা খেয়ে রওনা দেয়; বুড়োর কথা ঠিক কিনা সেটা পরখ করে দেখতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু সেটাকে সে দমন করল। সকালে রওনা দেওয়াই সব দিক দিয়ে ভালো হবে।

'ভালো কথা', বলল বুড়ো, 'মনে পড়েছে। আমায় লোকে জগাইবাবা বলে ডাকে। তুইও তাই বলিস।'

॥ ২ ॥

পরদিন সকালে লাল ফলটা খেয়ে জগাইবাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে

রাস্তায় পা দিতেই কানাই বুঝল তার গায়ের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে। তারপর হাঁটতে গিয়ে দেখল হাঁটলে চলবে না—দৌড়তে হবে। সে দৌড় যে কী বেদম দৌড় সে আর কী বলব। রাস্তার দুপাশে গাছপালা ঘরবাড়ি মানুষজন গরু ছাগল সব তীরবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে উল্টোদিকে, পায়ের তলা দিয়ে মাটি সরে যাচ্ছে শন্ শন্ করে, দুকানের পাশে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে কানে প্রায় তালা লাগে, দেখতে দেখতে দুদিকের দৃশ্য বদলে যাচ্ছে—গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে মাঠ, মাঠ থেকে বন, বন থেকে আবার গ্রামে। পথে দুটো নদী পড়ল, মুহূর্তের মধ্যে সে নদী কানাইয়ের পায়ের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল, পায়ের গোড়ালিটুকুও ভিজবার সময় পেল না।

সূর্য মাথায় ওঠার আগে কানাই বুঝতে পারল সামনে একটা বড় শহর দেখা যাচ্ছে। সে তখনই দৌড়ান বন্ধ করে হাঁটতে শুরু করল। বাকি পথটুকু এমনিভাবে হেঁটেই যাবে, নইলে অন্য পথচারীরা কী ভাববে ? তাকে নিয়ে একটা হৈচৈ পড়ে এটা কানাই মোটেই চায় না।

শহরে ঢোকবার মুখে একটা তোরণ, তার দুদিকে দুজন সশস্ত্র সেপাই। এটা আগে থেকে জানা ছিল না, তাই কানাইকে একটু মুশকিলেই পড়তে হয়েছিল। সেপাইরা কানাইকে দেখেই তার পথ রোধ করতে গিয়েছিল, তাই নিরুপায় হয়ে কানাইকে সামান্য একটু দৌড় দিতে হয়েছিল। ফলে কানাই এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল যেখান থেকে তোরণটা এত দূরে যে সেটাকে প্রায় দেখাই যায় না।

আর কোনো ভাবনা নেই। কানাই এখন একটা বাজারের মধ্যে দিয়ে চলেছে। দুদিকে দোকানপাট, তাতে নানারকম জিনিসের মধ্যে কাপড়ই বেশি, আর সেই কাপড়ের বাহার দেখে কানাই ত থ। দেশ-বিদেশের লোকেরা সে কাপড় দেখছে, দর করছে, কিনছে। কিন্তু একটা জিনিস দেখে কানাইয়ের ভারী অদ্ভুত লাগল। যারা সে কাপড় বেচছে তাদের কারুর মুখে হাসি নেই। আর, আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার হল, হাটের এখানে সেখানে হাতে বল্লমওয়ালা সেপাইরা ঘোরাফেরা করছে।

কানাইয়ের ভারী কৌতূহল হল। সে একটা কাপড়ের দোকানে গিয়ে দোকানদারকে জিগ্যেস করল, 'এই শহরের নাম কি রূপসা ?' লোকটা মুখে কিছু না বলে কেবল মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানাল। এবার কানাই বলল, 'তা

তোমরা সবাই এত গম্ভীর কেন বল ত ? কেনা-বেচা ত বেশ ভালোই হচ্ছে ; তবু তোমাদের মুখে হাসি নেই কেন ?'

লোকটা এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে বলল,'তুমি বুঝি ভিন দেশের লোক ?'

কানাই বলল, 'হ্যাঁ ; আমি সবে এখানে এলাম।'

'তাই তুমি জান না', বলল দোকানদার। 'এখানে মড়ক লেগেছে।'

'মড়ক ?'

'শুখনাইয়ের মড়ক। এখন তাঁতি পাড়ায় লেগেছে, কিন্তু ছড়িয়ে পড়তে আর কতদিন ? তাঁতিরা সব না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে।'

'কিন্তু—'

কানাই ওষুধের কথাটা বলতে গিয়ে বলল না। আশ্চর্য ব্যাপার !—মন্ত্রী গিয়ে চাঁদনি গাছ নিয়ে এসেছে, তাও কেন তাঁতিদের অসুখ সারছে না ? এই গাছের পাতায় কি তাহলে কাজ দেয় না ? একটা আস্ত গাছে কত পাতা হয় ? চার-পাঁচশো ত বটেই। তার একটা খেলেই একটা লোকের অসুখ সারার কথা। কিন্তু সে গাছ তাহলে গেল কোথায় ?

কানাই উঠে পড়ল। তার মনে পড়ে গেছে যে এখানে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হল চাঁদনির পাতা জোগাড় করা। কিন্তু সেই গাছ তার নাগালে আসবে কি করে ? মন্ত্রীমশাই সে গাছ কোথায় রেখেছেন সেটা সে জানবে কি করে ?

কানাই হাঁটতে আরম্ভ করল। বাজার ছাড়িয়ে সে দেখল একটা পাড়ার মধ্যে এসে পড়েছে। এখানে চারিদিক থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। এটাই কি তাঁতিপাড়া ?

রাস্তার ধারে একটা বুড়ো বসে আছে দেখে কানাই তার দিকে এগিয়ে গেল।

'হ্যাঁ গো, এটা কি তাঁতি পাড়া।' কানাই জিগ্যেস করল।

বুড়ো মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এটাই তাঁতি পাড়া। তবে তাঁতি আর এখানে বেশিদিন নেই। চারটে করে তাঁতি রোজ মরছে ব্যারামে। শশী গেল, নীলমণি গেল, লক্ষ্মণ গেল, বেচারাম গেল—আর কি ! এ রোগের ত কোনো চিকিৎসা নেই। আমায় এখনো ধরেনি রোগে, তবে ধরতে আর কত দিন ?'

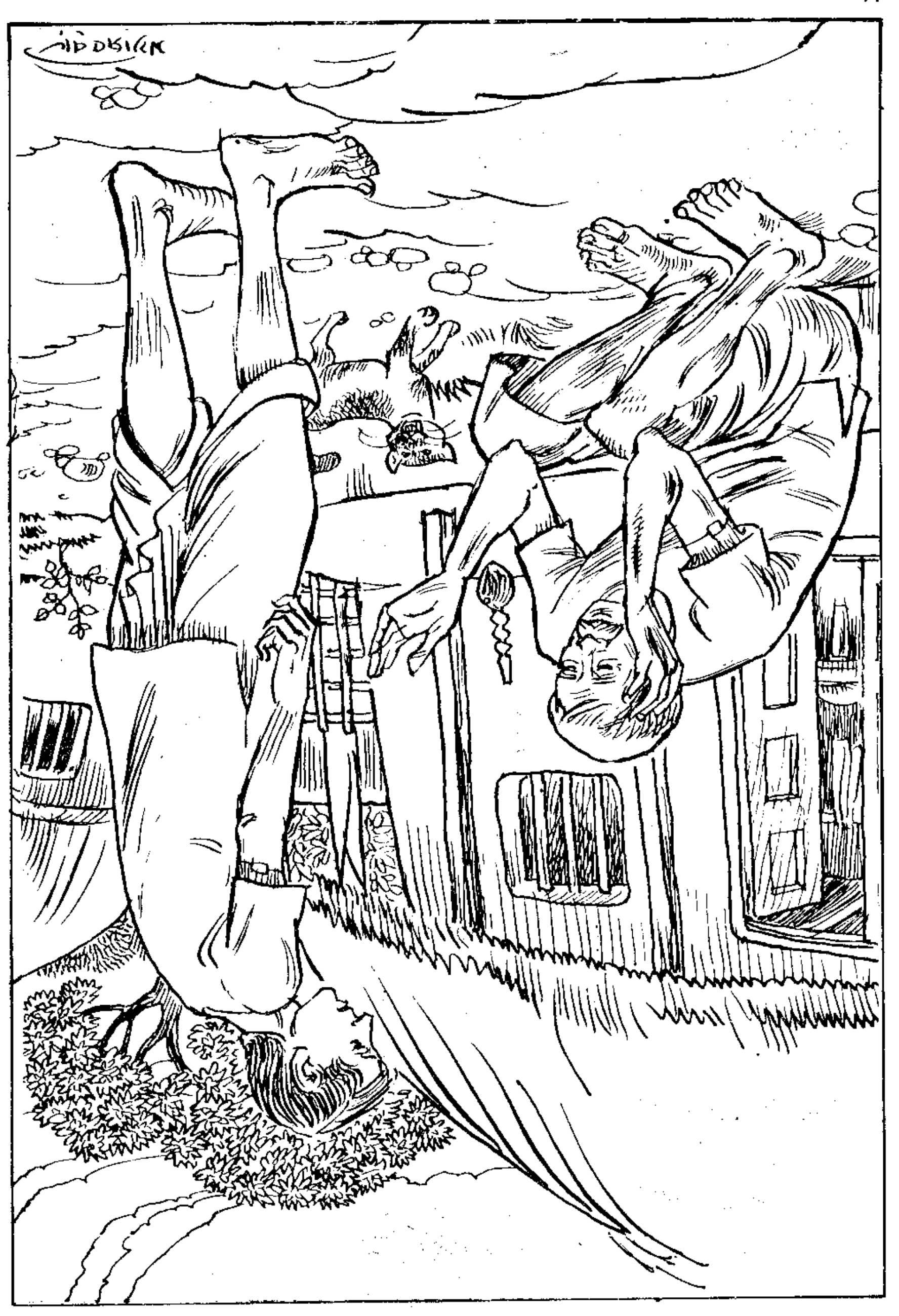

'চিকিৎসা নেই বলছ কেন ? একটা গাছের পাতার রস খেলেই ত এ ব্যারাম সারে। সে গাছ ত তোমাদের মন্ত্রীমশাই বাদড়ার জঙ্গলে গিয়ে নিয়ে এসেছেন।'

'তাঁতিদের তাতে লাভটা কী ? সে গাছ তো মন্ত্রীমশাই আমাদের দেবেন না।'

'কেন, দেবে না কেন ?'

'আমাদের রাজা বড় সর্বনেশে।' বুড়ো এদিক ওদিক সন্দেহের দৃষ্টি দিল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'এ রাজা পিশাচ। পেয়াদারা বল্লমের খোঁচা মেরে তাঁতিদের দিয়ে কাপড় বোনায়। যারা বোনে না তাদের শূলে চড়ায়। রূপসার কাপড় বিদেশ থেকে সদাগর এসে কিনে নিয়ে যায়। যা টাকা আসে তার চার ভাগের তিন ভাগ যায় রাজকোষে। তাঁতিরা সব এক জোটে রাজাকে হটিয়ে তার ছেলেকে সিংহাসনে বসাবে ঠিক করেছিল। সে কথা কেউ গিয়ে তোলে রাজার কানে। আর সেই সময় লাগে এই মড়ক। রাজা চায় তাঁতিরা সব মরুক। তাই ওষুধ এনে সরিয়ে রেখেছে।'

কানাইয়ের মনটা শক্ত হয়ে উঠল। এমন শয়তান রাজা এই রূপসার রাজ্যে ? সে যে-করে হোক চাঁদনির পাতা এনে দেবে তাঁতিদের জন্য। যে-করে হোক্ !

বুড়ো বলে চলল, 'রাজা শয়তান, কিন্তু তার যে ছেলে রাজকুমার, সে সোনার চাঁদ ছেলে। তোমারই মতন বয়স তার। সে যদি রাজা হয় তাহলে দেশের সব দুঃখু দূর হবে।'

'এই রাজাকে সরাবার কোনো রাস্তা নেই বুঝি ?'

'সে কি আর আমরা জানি ? আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আমরা শুধু দুঃখু পেতেই জানি।'

আরো একটা কথা জিগ্যেস করার ছিল বুড়োকে।

'রাজবাড়িটা কোন দিকে বলতে পার ?'

'এই রাস্তা দিয়ে সোজা গেলে রাজপথ পড়বে। বাঁয়ে ঘুরে দেখবে দূরে রাজার কেল্লার ফটক দেখা যাচ্ছে। তবে তোমায় সেখানে ঢুকতে দেবে না। পাহারা বড় কড়া।'

কানাই বুড়োর কাছে বিদায় নিয়ে কিছুদূর গিয়েই রাজপথে পড়ল। বাঁ

দিকে ঘুরে সত্যিই দেখল দূরে কেল্লার ফটক দেখা যাচ্ছে।

কানাই ইতিমধ্যে মতলব এঁটে নিয়েছে। সে এমনি ভাবে হেঁটে গিয়ে যখন ফটক থেকে বিশ হাত দূরে, প্রহরী তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে, তখন সে দিল ফটক লক্ষ করে বেদম ছুট।

চোখের পলকে কানাই প্রথম ফটক দ্বিতীয় ফটক পেরিয়ে পৌঁছে গেল একটা বাগানে। এখানে আশেপাশে কোনো লোক নেই দেখে কানাই থামল। বাঁ দিকে বাগান, তাকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে আছে শ্বেত পাথরের দালান।

কানাই কী করবে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল। বাগানে ফুলের ছড়াছড়ি, চারিদিক রঙে রঙ, কে বলবে এই দেশে শুখ্‌নাইয়ের মড়ক লেগেছে!

এই ফুলের মধ্যেই কি চাঁদনি গাছ রয়েছে? ছোট ছোট ছুঁচলো বেগুনী পাতা আর হল্‌দে ফুল। যদি এরই মধ্যে থাকে তাহলে তার কাজ অনেক সহজে হয়ে যায়।

এদিক ওদিক দেখতে দেখতে কানাই এগোচ্ছিল, হঠাৎ তার পিঠে পড়ল একটা হাত, আর আরেকটা হাত তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে কোলপাঁজা করে তুলে নিল।

কানাই দেখল সে এক অতিকায় প্রহরীর হাতে বন্দী।

॥ ৩ ॥

প্রহরী কানাইকে সোজা নিয়ে গেল রাজসভায়। কানাই দেখল রাজা সিংহাসনে বসে আছেন, আর তাঁকে ঘিরে রয়েছে সভাসদরা। রাজা যে শয়তান সেটা তাঁর কুৎকুতে চোখ, ঘন ভুরু আর গালপাট্টা দেখলেই বোঝা যায়।

'এটাকে কোত্থেকে পেলি?' রাজা কানাইয়ের দিকে চোখ রেখে পেয়াদাকে জিগ্যেস করলেন।

'মহারাজ, এ অন্দরমহলের বাগানে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছিল।'

'এ ব্যাটা ফটক দিয়ে ঢুকল কি করে? দু দুটো সশস্ত্র প্রহরী রয়েছে সেখানে!'

'তা জানি না মহারাজ!'

'হুঁ। বলবন্ত আর যশোবন্তকে শূলে চড়াও। ফটকে নতুন প্রহরী মোতায়েন করো। এ রাজ্যে কাজে ফাঁকির শাস্তি মৃত্যু।'

মহারাজের পাশে দু-তিনজন কর্মচারী আদেশ পালন করার জন্য হাঁ হাঁ করে উঠল।

রাজা এবার কানাইয়ের দিকে দৃষ্টি দিলেন।

'তোর ব্যাপার কী শুনি। তোর নাম কী?'

'আজ্ঞে আমার নাম কানাই।'

'কোত্থেকে আসছিস?'

কানাই ঠিকই করেছিল যে রাজার কাছে সে সব কথা সত্যি বলবে না। সে বলল, 'আজ্ঞে পাশের গাঁ থেকে।'

'কাগমারি?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'বাগানে কী খুঁজছিলি?'

'কই, কিছু খুঁজিনি ত। শুধু দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

রাজা যেন একটু নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন, 'ঠিক আছে; এখন একে হাজতে পোরো। পরে এর বিচার হবে।'

তিন মিনিটের মধ্যে কানাই দেখল যে সে কারাগারে বন্দী। গরাদওয়ালা দরজা খড়াং শব্দে বন্ধ হতেই সে হতাশ হয়ে কারাগারের এক কোণে বসে পড়ল। আর আট দিন বাকি আছে। তার মধ্যে চাঁদনির পাতা নিয়ে দেশে ফিরতে না পারলে তার বাপকে সে চিরতরে হারাবে।

এমন হতাশ কানাইয়ের কোনোদিনও লাগেনি। জগাইবাবার কথা মনে পড়ল তার। নীল আর লাল ফল দুটো আর ঝিনুকটা এখানো তার ট্যাঁকে রয়েছে। কিন্তু কই, জগাইবাবা ত তাকে আর ডাকল না। ওগুলো দিয়ে কী কাজ হয় তাও জানা গেল না।

কয়েদখানার একটা মাত্র খুপ্‌রি জানালা; সেটা পশ্চিম দিকে হওয়াতে তার ভিতর দিয়ে বিকেলের রোদ এসে পড়েছে। কমলা রঙের রোদ দেখে কানাই বুঝল যে সূর্য অস্ত যাবার মুখে।

ক্রমে সেই আলোটুকুও চলে গিয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। ঘরের বাইরে একজন প্রহরী, সে সেখানে টহল ফিরছে। তার পায়ের একটানা খট্ খট্ শব্দে

কানাইয়ের চোখে ঘুম এল, আর দশ মিনিটের মধ্যেই কানাই ঘুমে ঢলে পড়ল।

এই ভাবে জেগে ঘুমিয়ে, কয়েদখানার অখাদ্য খাওয়া খেয়ে, তিনদিন চলে গেল। সময় আর মাত্র পাঁচ দিন। সন্ধ্যা হয়-হয়, কানাইয়ের চোখে ঘুমের আমেজ, মন থেকে আশা প্রায় মুছে এসেছে, এমন সময় সে হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল। বাইরে প্রহরী এখনো টহল দিচ্ছে, কে যেন এর মধ্যে বাইরে একটা মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, তার আলোয় ফটকের গরাদের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে কারাগারের মেঝেতে।

কিন্তু কানাইয়ের ঘুমটা ভাঙল কেন?

কান পাততেই কানাই কারণটা বুঝল।

তার ট্যাঁকের ঝিনুক থেকে একটা শব্দ আসছে।

'কানাই! কানাই! কানাই!'

কানাই তাড়াতাড়ি ঝিনুকটা বার করে কানের উপর চেপে ধরল। তার পরেই সে পরিষ্কার শুনতে পেল জগাইবাবার কথা।

'শোন্, কানাই, মন দিয়ে শোন্। আরো কিছু কথা মনে পড়েছে। তোর কাছে যে নীল ফলটা আছে সেটা খেলে তোর মধ্যে অদৃশ্য হবার শক্তি আসবে। কিন্তু অদৃশ্য হতে গেলে আগে একটা কথা বলে নিতে হবে। সেটা হল "ফক্কা"। সেটা বললেই তোকে আর কেউ দেখতে পাবে না। আবার যখন নিজের চেহারায় ফিরে আসতে চাইবি, তখন বলতে হবে "টক্কা"। বুঝলি?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি', মনে মনে বলল কানাই।

'আচ্ছা, এবার আরেকটা কথা বলি—সেটাও হঠাৎ মনে পড়ল। রূপসার রাজা তার ছেলেকে বন্দী করে রেখেছে প্রাসাদের ছাতের কোণে একটা ঘরে। বাবাকে হটিয়ে ছেলে সিংহাসনে না বসা অবধি রূপসার কোনো গতি নেই; শুখ্‌নাই অসুখে সারা দেশ ছারখার হয়ে যাবে। রাজাকে এক সদাগর এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে একটা পান্না বিক্রী করে আজ থেকে সাত বছর আগে। এই পান্না রাজার গলার হারে বসানো। এই পান্নায় জাদু আছে; এটাই যত নষ্টের গোড়া। বুঝছিস?'

কানাই বুঝেছে ঠিকই, কিন্তু চাঁদনির পাতা কি করে পাওয়া যাবে সেই নিয়ে

ত জগাইবাবা কিছুই বললেন না !

ঝিনুকের ভিতর আবার কথা শোনা গেল।

'চাঁদনি উদ্ধার করায় বড় বিপদ। কিন্তু তারও রাস্তা আছে।'

'কী রাস্তা ?'

'সেটা মনে পড়ছে না', বলল জগাইবাবা। 'পড়লে বলব।'

ব্যস্, কথা শেষ। কানাই কানে সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছে। সে ঝিনুটাকে আবার ট্যাঁকে গুঁজে নিল।

প্রহরী এখনো টহল দিচ্ছে। লম্বা টহল, তার গোড়ায় আর শেষটায় প্রহরী কানাইয়ের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। বাঁ দিকে একবার প্রহরী অদৃশ্য হতেই ট্যাঁক থেকে নীল ফলটা বার করে কানাই টপ্ করে মুখে পুরে দিল। তারপর প্রহরী ডান দিকে অদৃশ্য হতেই কানাই ধাঁ করে বলে দিল 'ফক্কা !'

প্রহরী ফেরার পথে কয়েদখানার দিকে দেখেই চমকে উঠল। তার টহল থেমে গেল।

সে প্রথমে গরাদের ফাঁক দিয়ে ভিতরে দেখল—এ-কোণ, ও-কোণ, সে-কোণ।

তারপর মশালটা গরাদের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে আবার দেখল।

তারপর মশাল রেখে চাবি দিয়ে ফটক খুলে অতি সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল। তার চোখে অবাক ভাবটা তখন দেখবার মতো।

কানাই এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করছিল। প্রহরীকে বেশ কিছুটা ভিতরে ঢুকতে দিয়ে টুক্ করে পাশ কাটিয়ে খোলা ফটক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

পা টিপে টিপে কোনো শব্দ না করে দুজন প্রহরীর নাকের সামনে দিয়ে কানাই বেরিয়ে এসে পৌঁছাল একটা ঘোরানো সিঁড়ির মুখে।

সেই সিঁড়ি দিয়ে সে উঠতে লাগল উপরে। নির্ঘাৎ এ সিঁড়ি ছাতে গিয়ে পৌঁছেছে।

হ্যাঁ, কানাইয়ের আন্দাজে ভুল নেই। সিঁড়ি উঠে গিয়ে একটা দরজার মুখে পৌঁছেছে, সেই দরজা পেরোতেই কানাই দেখল সে ছাতে এসে পড়েছে।

পেল্লায় ছাত, এক কোণে একটা ঘর। তাতে একটা জানালা। সেই জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা টিমটিমে আলো। ঘরের দরজার বাইরে বসে

আছে একটা প্রহরী, তার মাথা হেঁট।

অদৃশ্য কানাই এগিয়ে গেল প্রহরীর দিকে। যা আন্দাজ করেছিল তাই ; প্রহরী মুখ হাঁ করে ঘুমোচ্ছে, তার নাক দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে।

ঘরের দরজায় একটা বড় তালা ঝুলছে। বোধহয় তারই চাবি রয়েছে প্রহরীর কোমরে গোঁজা।

কানাই খুব সাবধানে প্রহরীর ঘুম না ভাঙিয়ে চাবিটা বার করে নিল। তারপর সেটা তালায় ঢুকিয়ে একটা প্যাঁচ দিতেই খুট্ করে তালা খুলে গেল। কী ভাগ্যি এই শব্দেও প্রহরীর ঘুম ভাঙেনি।

এবার দরজা খুলে অদৃশ্য কানাই ঘরের ভিতর ঢুকল। ঘরে একটা টেমি জ্বলছে, আর একটা খাটিয়ায় চোখে অবাক দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে তারই বয়সী একটি ফুটফুটে ছেলে। ঘরের দরজা খুলল, অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না, তাতে রাজকুমারের মুখ হাঁ হয়ে গেছে। একি ভেলকি নাকি ?

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কানাই এবার খাটের দিকে ঘুরে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'টক্কা !'—আর অমনি তার চেহারা দেখা যাওয়াতে রাজকুমার আরো চমকে উঠে ফিস্‌ফিসিয়ে জিগ্যেস করল, 'তুমি কে ? কোনো জাদুকর নাকি ?'

ফিস্‌ফিসিয়েই কথা হল, যদিও প্রহরীর নাক ডাকানি থেকে মনে হয় বাজ পড়লেও তার ঘুম ভাঙবে না।

কানাই রাজকুমারকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল। রাজকুমার বলল, 'গাছের কথা তুমি বলছ বটে, কিন্তু সে গাছ তুমি পাবে কি করে ? সে তো সহজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

'কি করে পাব তা জানি না', বলল কানাই, 'কিন্তু গাছের পাতা আমার চাই-ই। শুধু আমার বাবার জন্য নয় ; তোমাদের এখানে তাঁতিরা সব মরতে বসেছে। তাদের জন্য পাতা লাগবে। কম করে হাজার পাতা ত থাকবেই সে গাছে ; তাতে হাজার লোকের প্রাণ বাঁচবে।'

'আমিও ত তাদের বাঁচাতে চাই', বলল রাজকুমার। 'বাবাকে আমি সে কথা বলেছিলাম। বাবা তাতেই আমাকে বন্দী করে রাখার হুকুম দিলেন। বাবা নিজের ছাড়া আর কারুর ভালো চান না। নিজের ভালো মানে যত বেশি টাকা আসে কোষাগারে ততই ভালো। ধর্মেকর্মে বাবার মতি নেই, প্রজাদের মঙ্গলের চিন্তা নেই, আমি যে তার নিজের ছেলে তার জন্যেও মায়া-মমতা

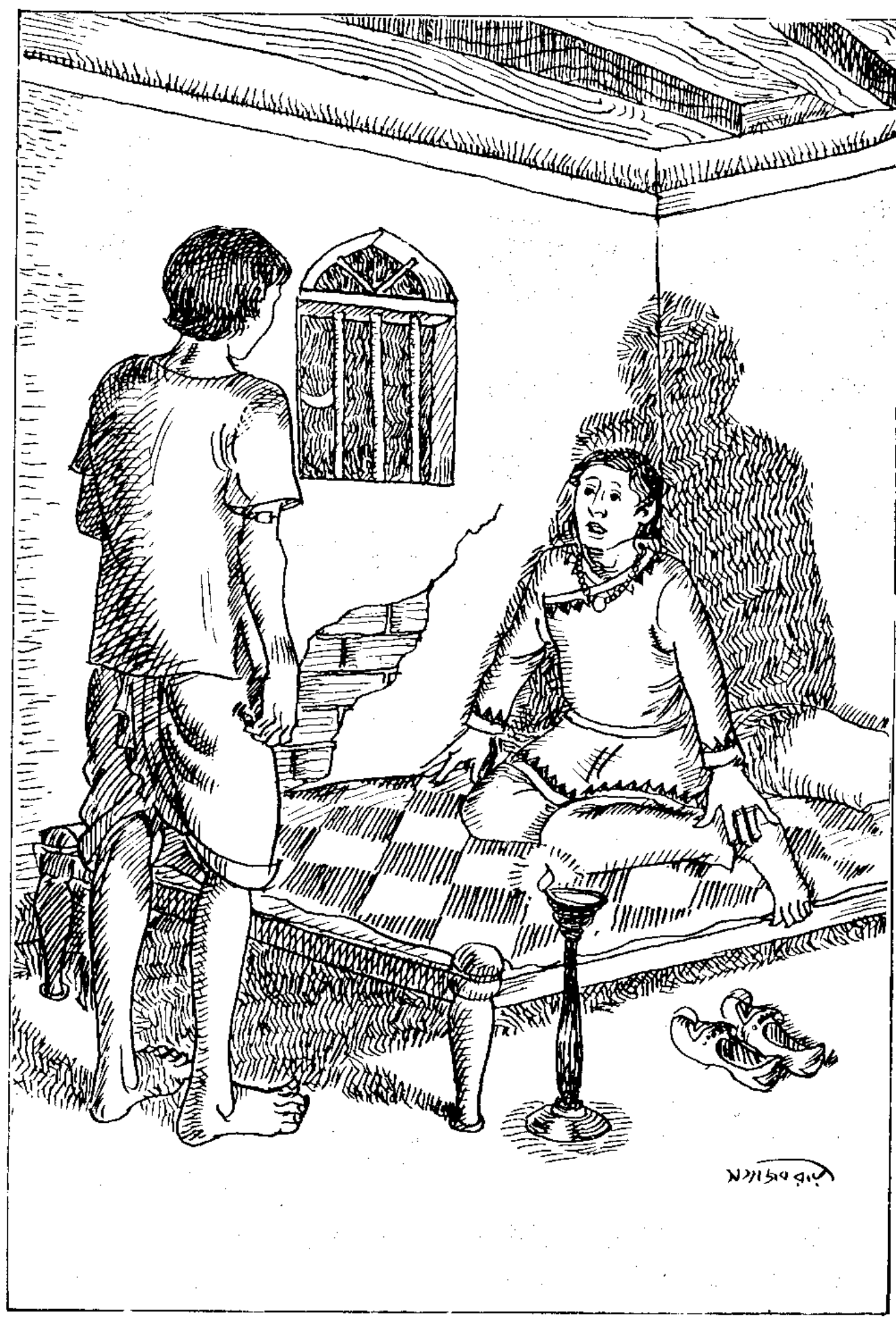

কিচ্ছু নেই।'

কানাই বলল, 'আচ্ছা, তোমার বাবার গলার হারে একটা জাদুপান্না আছে, তাই না?'

'তা ত বটেই। সাত বচ্ছর আগে এক সদাগর বাবাকে সেটা বেচে। সেই থেকে বাবার একটা দিনের জন্যও কোনো অসুখ হয়নি, আর বাবার অত্যাচারও বেড়ে গেছে তিন গুণ। এখানকার তাঁতিরা তাঁকে সিংহাসন থেকে সরাবার ফন্দি করেছিল। হয়ত তারা সে কাজে সফল হত, কিন্তু সেই সময়ই লাগে শুখ্‌নাইয়ের মড়ক।'

কানাই একটু ভেবে বলল, 'আচ্ছা, একটা কথা বল দেখি। রাজামশাইয়ের শোবার ঘরটা কোথায়? আমি ত ইচ্ছা করলে অদৃশ্য হতে পারি। আমি যদি তার গলা থেকে হারটা খুলে নিয়ে আসি?'

রাজকুমার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

'বাবার শোবার ঘর রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে। কিন্তু তার দরজায় প্রহরী ছাড়াও একটা ভয়ানক হিংস্র কুকুর পাহারা দেয়। সে তোমাকে দেখতে না পেলেও তোমার গন্ধ পাবে, আর পেলেই চীৎকার শুরু করবে। না, ওভাবে হবে না। অন্য উপায় দেখতে হবে। যা করতে হবে দিনের বেলা।'

কানাই একটুক্ষণ চুপ করে ভেবে বলল, 'তোমাকে ত এবার পালাতে হবে। আমি যখন এসেই পড়েছি, তখন আর তুমি বন্দী থাকবে কেন? রাজবাড়ি ছাড়া তোমার কোনো ঠাঁই আছে?'

'তা আছে', বলল রাজকুমার। 'তাঁতিদের মধ্যে আমার এক বন্ধু আছে, তার নাম গোপাল। তার এক বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। আমার নিজের মা-কে হারিয়েছি আমি তিন বছর বয়সে। গোপালের মা-কে আমি নিজের মায়ের মতো ভালোবাসি। বাবা গোপালের সঙ্গে মিশতে দেন না আমাকে; কিন্তু আজ যদি তার কাছে যাই, সে আমাকে ফিরিয়ে দেবে না।'

'তার বাড়িতে কি দুইজনের জায়গা হবে?'

'হবে বই কি। তিনজনে এক ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে থাকব। আমার খুব অভ্যাস আছে।'

'তাহলে চলো, চাঁদের আলোয় বেরিয়ে পড়ি।'

'কিন্তু ফটকে প্রহরী আছে যে?'

'প্রহরী আমাদের কিছু করতে পারবে না। তোমাকে পিঠে করে নিয়ে আমি ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাব। কেউ আমাদের নাগাল পাবে না।'

'সত্যি বলছ ?'

'সত্যি।'

'কিন্তু যে আমার এমন বন্ধুর কাজ করল, তার নামটা ত এখনো জানলাম না।'

'আমার নাম কানাই।'

'আর আমার নাম কিশোর।'

'তবে চলো যাই এবার। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে যাবো।'

'বেশ। নীচে সিঁড়ির মুখে দরজা পেরোলেই বাগান।'

'সেইখান থেকেই দেবো ছুট!'

॥ ৪ ॥

গোপালদের বাড়ি তাঁতি পাড়ার এক প্রান্তে। সেখানে শুখ্‌নাই রোগ এখনো পৌঁছায়নি, কিন্তু কবে এসে পৌঁছবে তার ঠিক কি ? গোপালের মা সেই কথা ভেবে কানাই আর কিশোরকে বলেছিলেন, 'আমার এখানে থাকার বিপদটা কী ত জান। সেটা ভেবেও কি তোমরা তিনজনে একসঙ্গে থাকতে চাও ?'

তিনজনেই মাথা নেড়ে বলেছিল—হ্যাঁ, তারা তাই চায়। সেই সঙ্গে কানাই বলেছিল, 'আপনি ভাববেন না। শুখ্‌নাই রোগের ওষুধ আছে রাজবাড়িতে। সে ওষুধ আমি জোগাড় করবই যে করে হোক। তাহলে আর কারুর ব্যারাম থাকবে না।'

কিন্তু মুখে বলা এক, আর কাজে আরেক।

তিনদিন কেটে গেল, তবু কাজ এগোল না একটুও। আর মাত্র দুদিন আছে কানাইয়ের বাপ, তারপরেই তার আয়ু শেষ। এদিকে ঝিনুকেও আর কোনো কথা শোনা যায়নি। জগাইবাবা এমন চুপ কেন ?

এর মধ্যে অবিশ্যি আরো অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে। কানাই আর রাজকুমার দুজনেই কয়েদী অবস্থা থেকে পালিয়েছে দেখে রাজবাড়িতে হুলস্থূল পড়ে গেছে। এ জিনিস কেমন করে হয় ? যে প্রহরী দুজন পাহারায় ছিল তাদের

দুজনকেই শূলে চড়ানো হয়েছে। কানাই আর কিশোরকে ধরার জন্য শয়ে শয়ে সেপাই সারা রাজ্যে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে। গোপাল তাঁতির সঙ্গে যে রাজকুমারের ভাব ছিল সেটা রাজা জানতেন, তাই গোপালের বাড়িতেও পেয়াদা পাঠিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় কানাই বুদ্ধি করে 'ফক্কা' বলে অদৃশ্য হয়ে পেয়াদার হাত থেকে বল্লম টেনে নিয়ে তাকে ল্যাঙ মেরে ফেলে দিয়েছে ; পেয়াদা এই ভেল্‌কিতে ভড়কে গিয়ে দিয়েছে চম্পট।

তারপর থেকে গোপালের বাড়িতে আর কেউ আসেনি।

আজ কানাই আর সবুর সইতে না পেরে কিশোরকে বলল, 'হ্যাঁ ভাই, সেই জাদুপান্না না সরাতে পারলে ত আর চলছে না। একবার একটু ভেবে বল দেখি তোমার বাবা একা কখন থাকেন, তার কাছাকাছি যাবার সুযোগটা কখন পাওয়া যায়।'

কিশোর বলল, 'জাদুপান্না নিলেই যে সব গোল মিটে যাবে তেমন ভেবো না। বরং উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হতে পারে, বাবার রাগ সপ্তমে চড়ে যেতে পারে।'

কানাই বলল, 'তাও চেষ্টা করতে ক্ষতি কী ? তুমি একবার একটু ভেবে বল।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজে ভেবে রাজকুমার বলল, 'একটা কথা মনে পড়েছে।'

'কী কথা ?'

'বাবা রোজ ভোরে সূর্যোদয়ের সময় রাজবাড়ির অন্দরমহলের দীঘিতে স্নান করতে যান। সেই সময় প্রহরী থাকে দূরে ; বাবার কাছাকাছি কেউ থাকে না।'

'তবে আর কী !' বলল কানাই, 'এই ত সুযোগ। কাল ভোরে আমি রাজবাড়ি যাব অদৃশ্য হয়ে। দেখি তোমার বাবার সঙ্গে দীঘিতে গিয়ে কিছু করা যায় কিনা।'

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই কানাই 'ফক্কা' বলে অদৃশ্য হয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে রাজবাড়ি পৌঁছে দীঘির শ্বেতপাথরে বাঁধানো ঘাটের কাছেই একটা বকুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রইল। পূব আকাশে পদ্মের রং ধরেছে কিন্তু সূর্য তখনও ওঠেনি।

কিছু পরে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কানাই খট্ খট্ শব্দ শুনে বুঝল রাজা

খড়ম পায়ে ঘাটে আসছেন।

ওই যে রাজা ! রাজার গা খালি। পরনে কেবল ধুতি আর কাঁধের উপর একটা রেশমের উত্তরীয়। উত্তরীয়টা ঘাটের পাশের বেদীতে রেখে রাজা খড়ম খুলে সিঁড়ির দিকে এগোলেন। গলার হারের পান্নাতে সূর্যের আলো পড়ে যেন তার থেকে আগুন বেরোচ্ছে।

এবার রাজা জলে নামলেন। কানাইও এগিয়ে গেল ঘাটের সিঁড়ির দিকে, তারপর ধীরে ধীরে সেও জলে নেমে রাজার সাত হাত দূরে গলা জলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

রাজা যেই ডুব দিলেন, অমনি কানাইও ডুব দিয়ে সাঁতরে এগিয়ে এসে পলকের মধ্যে রাজার গলা থেকে হার খুলে নিয়ে আবার ডুব সাঁতার দিয়ে দীঘির উল্টো পারে গিয়ে জল থেকে উঠল।

ততক্ষণে রাজা দিশেহারা হয়ে জলে তাঁর হার খুঁজছেন আর 'প্রহরী, প্রহরী' বলে ডাকছেন।

প্রহরী ছুটে এল। 'কী হল মহারাজ ?'

'এই সেই শয়তান রাঘব বোয়ালের কাজ। আমার গলা থেকে হার খুলে নিয়ে গেল। খবর দিয়ে দে। দরকার হলে দীঘির জল সেঁচতে হবে। হার আমার ফেরত চাই।'

ইতিমধ্যে অদৃশ্য কানাই হাতের মুঠোয় হার নিয়ে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এক ছুটে মুহূর্তের মধ্যে চলে এল একেবারে গোপালের বাড়ি। তারপর 'টক্কা' বলে আবার নিজের চেহারায় ফিরে এসে রাজকুমারকে দেখিয়ে দিল যে তার কাজ সে করে এসেছে।

কিন্তু এর ফলে রাজার মধ্যে কোনো পরিবর্তন এল কিনা সেটা কী করে বোঝা যাবে ?

কানাইয়ের সে বুদ্ধিও মাথায় এসে গেছে। সে বলল, 'আমি কাল অদৃশ্য হয়ে রাজসভায় যাবো। রাজার হাবভাব কিরকম সেটা দেখে আসব।'

তাই ঠিক হল, আর কানাই পরদিন রাজসভায় গিয়ে হাজির হল।

সভাসদরা এসে গেছেন, কিন্তু রাজা তখনো আসেননি।

কানাই পিছনের দিকে এক কোণায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল।

সময় চলে যায়, কিন্তু রাজার দেখা নেই।

প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষার পরে রাজামশাই এসে ঢুকলেন রাজসভায়।

কিন্তু কই, রাজার চেহারায় ভালোর দিকে পরিবর্তনের ত কোনো লক্ষণ নেই। চোখে ত সেই একই শয়তানের দৃষ্টি, কেবল ঠোঁটের কোণে ব্যাঁকা হাসির বদলে আজ প্রচণ্ড রাগ।

রাজা সিংহাসনে বসে চারিদিকে একবার লাল চোখে দেখে নিয়ে বললেন, 'আমার রাজ্যে মহা শয়তান এক জাদুকরের আবির্ভাব হয়েছে। সে নিজে কয়েদখানা থেকে প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে, আমার ছেলেকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়েছে, আমার গলা থেকে আমার সাধের পান্নার হার খুলে নিয়েছে। গতকাল ভোরে দীঘিতে ডুব দেবার সময় এই ঘটনা ঘটে। আমি ভেবেছিলাম এ বোয়াল মাছের কাণ্ড, কিন্তু দীঘির জল সেঁচে সেই বোয়াল মাছকে ধরেও সে হার পাওয়া যায়নি। আজ থেকে শাসন হবে আরো দশগুণ কড়া। যতদিন সেই জাদুকর আর রাজকুমারকে খুঁজে না পাওয়া যায়, ততদিন হাটবাজার সব বন্ধ। লোকে না খেয়ে মরে মরুক!'

এই ভীষণ কয়েকটা কথা বলে রাজা সিংহাসন ছেড়ে চলে গেলেন। কানাই একেবারে মুসড়ে পড়ল। জাদুপান্না খুলে নিয়ে ফল আরো খারাপ হল। এখন কী উপায়?

কানাই গোপালের বাড়ি ফিরে এল।

তার কাছ থেকে সব শুনে-টুনে কিশোর আর গোপালের মুখও শুকিয়ে গেল। একে দেশে মড়ক, তার উপর রাজার এই মূর্তি! সারা দেশ ত ছারখার হয়ে যাবে।

কানাই তখন মনে মনে ভাবছে—আর একদিন মাত্র সময়। এই একদিনের মধ্যে চাঁদনির পাতা জোগাড় না হলে সে বাবাকে হারাবে।

দূর থেকে ঢ্যাঁড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে ঘোষণা। আজ থেকে বাজারে কেনাবেচা বন্ধ। সেই সঙ্গে এও ঘোষণা হচ্ছে যে রাজকুমার আর জাদুকরকে যে ধরে দিতে পারবে তাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে। ঢ্যাঁড়ার দুম্ দুম্ শব্দ ক্রমে এদিকে এগিয়ে আসছে। তাঁতি পাড়াতেও ঘোষণা হবে।

এই ডামাডোলের মধ্যেই কানাই হঠাৎ চমকে উঠল।

তার নাম ধরে কে ডাকে ক্ষীণ স্বরে ?

সে তৎক্ষণাৎ ট্যাঁক থেকে ঝিনুক বার করে কানে দিল। পরিষ্কার শোনা গেল জগাইবাবার কথা।

'শোন্ কানাই, মন দিয়ে কাজের কথা শোন্। কাল সকালে এক প্রহরে তুই যাবি রাজবাড়ির অন্দরমহলের বাগানের ঈশান কোণে। সেই কোণে জলে ঘেরা একটা ছোট্ট দ্বীপে চাঁদনি গাছ পোঁতা আছে। সেই গাছ তোকে উদ্ধার করতে হবে।'

'কী করে জগাইবাবা ?'

'সেটা হবে তোর নিজের বুদ্ধি আর সাহসের জোরে। কাজটা সহজ নয়। বুঝলি ?'

'বুঝলাম, কিন্তু—'

'কিন্তু কী ?'

'হল্‌দে ফলের গুণ কী সেটা ত বললেন না।'

'এখনো মনে পড়েনি। পড়লে বলব। আগে তোর বাপকে বাঁচাবার ব্যবস্থা কর। তার প্রায় শেষ অবস্থা। তবে পাতার রস খেলেই সে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আসি।'

ঝিনুকের মধ্যে আবার সমুদ্রের গর্জন।

কানাই সব ঘটনা বলল কিশোর আর গোপালকে। 'কাল এক প্রহর', সব শেষে বলল কানাই। 'কালই এসপার নয় ওসপার।'

॥ ৫ ॥

জগাইবাবার নির্দেশ মতো কানাই সকাল থেকেই অদৃশ্য হয়ে বাগানে হাজির হল। তারপর বাগানের ঈশান কোণে গিয়ে যা দেখল তাতে তার চক্ষুস্থির। একটা ছোট্ট দ্বীপে চাঁদনি গাছটা পোঁতা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই এক-মানুষ উঁচু গাছটার গোড়ায় পেঁচিয়ে আছে একটা শঙ্খচূড় সাপ, যার এক ছোবলেই একটা মানুষ পায় অক্কা। আর দ্বীপটাকে ঘিরে আছে একটা পাঁচ হাত চওড়া পরিখা, তাতে কিলবিল করছে পাঁচ-সাতটা কুমীর। কানাই যখন

পৌঁছাল তখন সেই কুমীরগুলোর দিকে কোলা ব্যাঙ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে একটা লোক, আর সেগুলো কপ্ কপ্ করে গিলে খাচ্ছে কুমীরগুলো। একটা ব্যাঙ সাপটার দিকেও ছুঁড়ে দেওয়া হল, আর সেটা তক্ষুনি সে মুখে পুরে গিলতে আরম্ভ করল।

খাওয়া শেষ হলে কানাই দুগ্গা বলে কাজে লেগে গেল। আজই শেষ দিন, আজ তাকে যে করে হোক চাঁদনির পাতা জোগাড় করতেই হবে।

বাগানের এক পাশে পাঁচিলের ধারে কিছু বাঁশ পড়ে আছে। অদৃশ্য কানাই তার থেকে দুটো বাঁশ নিয়ে সেগুলোকে পরিখার পাঁচিলে এমনভাবে শুইয়ে রাখল যে বাঁশের অন্য দিক দ্বীপের উপর গিয়ে পড়ে। ফলে বেশ একটা সেতু তৈরি হয়ে গেল কুমীর বাঁচিয়ে দ্বীপে যাবার জন্য।

কিন্তু সাপের কী হবে ?

তার জন্য চাই অস্ত্র।

কানাই বাগানের ফটকে গিয়ে দেখলে সেখানে হাতে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে একটা সেপাই দাঁড়িয়ে আছে। অদৃশ্য কানাই তার হাত থেকে একটানে তলোয়ারটা বার করে নিল। তারপর সেপাইকে হতভম্ব করে দিয়ে শূন্য দিয়ে সে তলোয়ার নিয়ে বাঁশের সেতুর উপর দিয়ে দ্বীপে পৌঁছে এক কোপে শঙ্খচূড়ের মাথা শরীর থেকে আলগা করে দিল। তারপর তলোয়ারটাকে পরিখার জলে ফেলে অদৃশ্য কানাই এক হ্যাঁচকায় শেকড়শুদ্ধ চাঁদনি গাছটাকে তুলে সেতু পেরিয়ে এসে ঝড়ের বেগে চলে এল গোপালের বাড়ি। তারপর 'টক্কা' বলে সে নিজের চেহারায় ফিরে এল।

গোপাল কানাইয়ের হাতে গাছ দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'চলো যাই ঘরে ঘরে পাতা বিলিয়ে আসি !'

'তাই যাও', বলল কানাই। 'তবে একটা পাতা আমি নিচ্ছি। আমি আবার ফিরে আসব বিকেল পড়তে না পড়তেই। আজই শেষ দিন ; আজ আমার বাবাকে বাঁচাবার শেষ সুযোগ।'

তীরের বেগে দেখতে দেখতে নন্দীগ্রামে তার বাড়িতে পৌঁছে গেল কানাই। বাবা বিছানায় পড়ে আছে, তার শরীরের প্রত্যেকটি হাড় গোনা যায়।

'কানাই, এলি ?' ক্ষীণ স্বরে জিগ্যেস করল বলরাম কৃষক।

কানাই তখন পাতার রস বার করতে শুরু করছে। বেগুনী পাতার বেগুনী রস।

'এই নাও বাবা, খেয়ে নাও।'

কোনো মতে ঘাড় উঁচু করে রস খেয়ে 'আঃ' বলে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে আবার বালিশে মাথা দিল বলরাম। আর তার পরমুহূর্তেই তার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল। 'অনেক আরাম বোধ করছি রে কানাই! তুই আমাকে বাঁচালি এ-যাত্রা।'

কানাই বাবাকে বলল তার একবার রূপসা যেতে হবে, সেখানকার খবর নেওয়া দরকার। কাজ সেরেই সে আবার ফিরে আসবে।

'তা যা', বলল বলরাম, 'তবে যাবার আগে কিছু ফল আর এক বাটি দুধ রেখে যাস খাটের পাশে। মনে হচ্ছে খিদে পাবে।'

কানাই বাবার ফরমাশ পালন করে রূপসা গিয়ে হাজির হল।

শহরের চেহারাই বদলে গেছে। তাঁতি পাড়ায় ঘরে ঘরে হাসিমুখ দেখতে দেখতে কানাই পৌঁছাল গোপালের বাড়ি। কিশোরও রয়েছে সেখানে, কিন্তু তার মুখ গম্ভীর।

'কী ভাবছ কিশোর ?' জিগ্যেস করল কানাই।

'ভাবছি বাবার কথা', বলল কিশোর। 'বাবারও ব্যারাম হয়েছে।'

'অ্যাঁ, সে কি! কী করে জানলে ?'

'ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে গেল। বলল রাজার অসুখ; রাজা আমাকে দেখতে চায়। আমি যেখানেই থাকি যেন গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি।'

'ব্যারাম মানে কী ব্যারাম ?' জিগ্যেস করল কানাই।

'শুখ্‌নাই। তাঁতির যা অসুখ; তোমার বাপের যা অসুখ, বাবারও সেই অসুখ। আর তার একমাত্র ওষুধ এখন আমাদের কাছে।'

'তা বেশ ত', বলল কানাই, 'সে ওষুধ তাকে দাও, কিন্তু একটা শর্তে।'

'কী শর্ত ?'

'তিনি যেন রোগ সারলেই রাজকার্য ছেড়ে তীর্থে যান। আর তাঁর জায়গায় তুমি বসো সিংহাসনে।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম', বলল কিশোর।

'একটা কথা বলব ?' হঠাৎ বলে উঠল গোপাল তাঁতি।

'কী কথা ভাই ?' জিগ্যেস করল কিশোর।

'তুমি রাজা হলে আমায় একটা নতুন তাঁত দেবে ? যেটা আছে সেটা আমার ঠাকুরদাদার। তাতে ভালো বোনা যায় না।'

'নিশ্চয়ই দেব', বলল কিশোর। 'তুমি হবে তাঁতির সেরা তাঁতি। তোমার বোনা কাপড় পরে আমি সিংহাসনে বসব।' তারপর কানাইয়ের দিকে ফিরে বলল, 'চলো যাই বাবার কাছে।'

কানাইয়ের পিঠে চড়ে এক মুহূর্তে প্রাসাদের অন্দর মহলে পৌঁছে গেল কিশোর। রাজবাড়িতে শোকের ছায়া পড়েছে। রাজার অসুখের একমাত্র ওষুধ চাঁদনির পাতা ভেলকির বশে রাজার উদ্যান থেকে উধাও হয়ে গেছে। আর বিশ দিন মাত্র আয়ু তাঁর।

রাজার শোবার ঘরের বাইরে প্রহরী কিশোর আর কানাইকে দেখে চমকে উঠল, কিন্তু তাদের কোনো বাধা দিল না। কিশোর আর কানাই সোজা গিয়ে ঢুকল রাজার ঘরে।

রাজা শয্যা নিয়েছেন, পাশে রাজ কবিরাজ মাথায় হাত দিয়ে বসে রাজার প্রশ্নের উত্তরে বলছেন আর কোনো জায়গায় চাঁদনি গাছ নেই, আর এ-রোগের আর কোনো চিকিৎসাও নেই।

ঠিক সেই সময় গিয়ে উপস্থিত হল কিশোর আর কানাই।

'তুই এলি !' ছেলেকে দেখে কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন রাজা। 'তবে তোর সঙ্গে এ কেন ?' এ যে পিশাচসিদ্ধ জাদুকর !'

'না বাবা', বলল কিশোর। 'এ হল রূপসার ভবিষ্যৎ মন্ত্রী।'

'অ্যাঁ !'

'হ্যাঁ বাবা। আমি সঙ্গে করে তোমার ওষুধ এনেছি। এই ওষুধ তোমাকে দেব যদি তুমি কথা দাও যে অসুখ সারলেই তীর্থে চলে যাবে চিরকালের মতো।'

'তা কেন দেব না কথা', বললেন রাজা, 'যত নষ্টের গোড়া ছিল ওই জাদুপান্না, যদিও রোগের হাত থেকে ওটাই আমাকে এতদিন রক্ষা করেছে। সেই পান্না যাবার পর থেকেই আমার দেহে আর মনে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। আমি বুঝেছি কত ভুল করেছি। আমি যাবো তীর্থে, আর তুই বসবি আমার

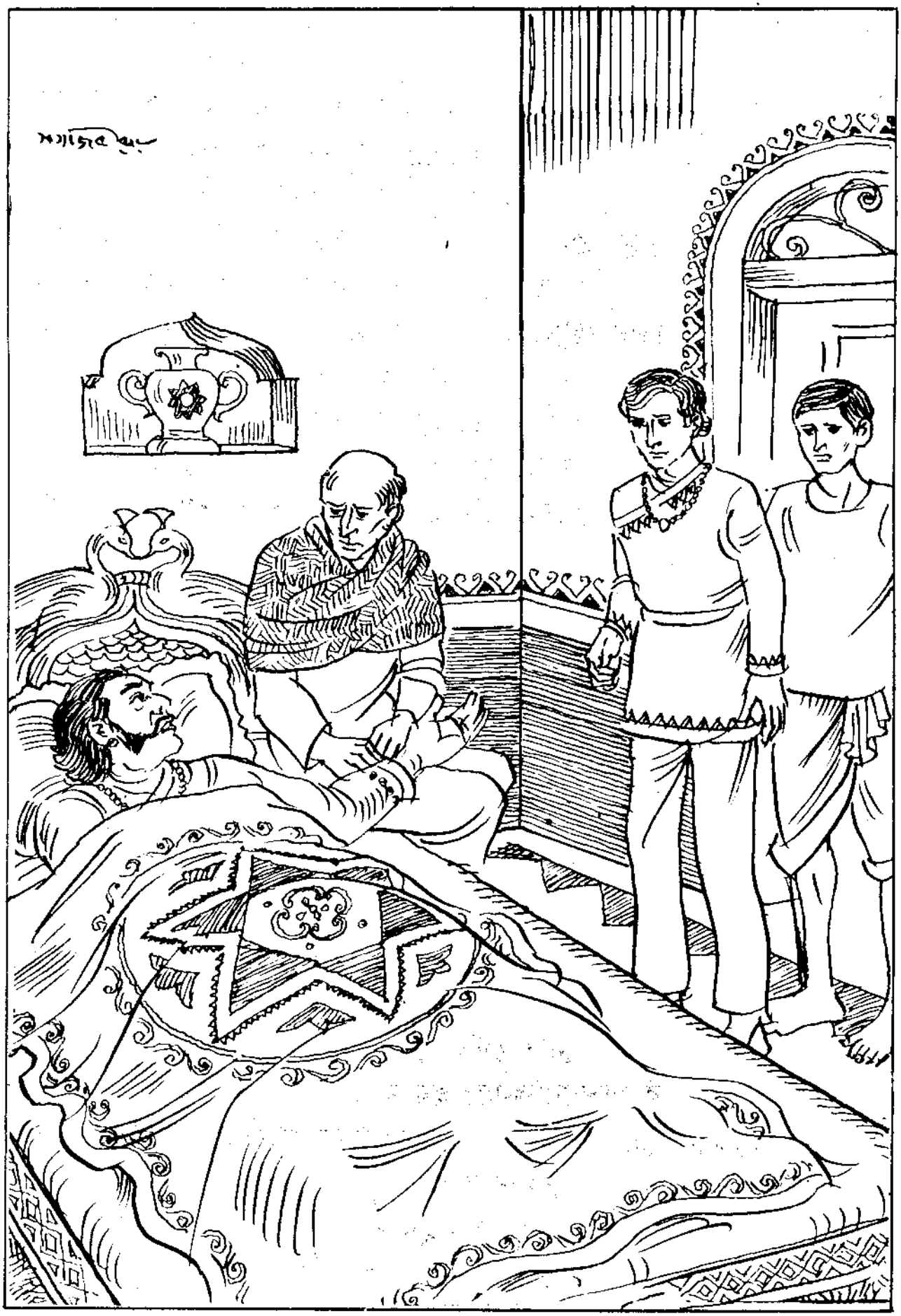

জায়গায় সিংহাসনে। রূপসার গৌরব ফিরিয়ে আনবি। লোকে ধন্য ধন্য করবে।'

রাজকুমার এবার তার হাতের মুঠো খুলে ধরল বাপের সামনে। সেই মুঠোয় চাঁদনির বেগুনী পাতা, তার সৌরভে রাজার শয়নকক্ষ ভরপুর হয়ে গেল।

রাজা সেরে উঠলেন একদিনেই।

তিনদিন পরে যুবরাজের অভিষেক হল। রাজা নিজে তার হাত ধরে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন ছেলেকে, তার পরনে গোপালের তৈরি পোষাক। তারপর কিশোর কানাইকে বসিয়ে দিল মন্ত্রীর আসনে। ইতিমধ্যে কানাই নন্দীগ্রামে গিয়ে তার বাবাকে নিয়ে এসেছে, কিশোর বলরামকে থাকবার ঘর দিয়েছে, তার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

চারদিকে শাঁখ বাজছে, রোশন চৌকিতে সানাই বাজছে, তারই মধ্যে মন্ত্রীর আসনে বসে কানাই শুনতে পেল জগাইবাবার ডাক।

'কানাই! কানাই! কানাই!'

কানাই রাজসভার মধ্যেই ট্যাঁক থেকে ঝিনুক বার করে কানে দিল। খ্যান খ্যান করে শোনা গেল জগাইবাবার কথা।

'তোর ত আস্পর্ধা কম না—তোর বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে তুই রূপসার মন্ত্রীর আসনে বসেছিস?'

'কি করব জগাইবাবা'; মনে মনে বলল কানাই, 'আমি কি আর নিজে থেকে বসেছি?—এরা আমায় বসিয়েছে।'

'তবে শোন বলি', এলো জগাইবাবার কথা। 'অ্যাদ্দিনে মনে পড়েছে। সেই হলদে ফলটা আছে ত?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আছে!'

'এইবার সেইটে খেয়ে নে। সেটা খেলে তোর বিদ্যেবুদ্ধি হাজার গুণ বেড়ে যাবে। মন্ত্রীগিরি কীভাবে করতে হয়, রাজাকে মন্ত্রণা কীভাবে দিতে হয়, দেশের মঙ্গল কিসে হয়, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন কাকে বলে—সব জানতে পারবি। তখন আর তোকে বেমানান লাগবে না, কেউ বলবে না তুই বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গেছিস। বুঝেছিস?'

'বুঝেছি জগাইবাবা, বুঝেছি।'

'তাহলে আসি।'

ঝিনুকে আবার সমুদ্রের গর্জন।

কানাই ঝিনুকটা আবার ট্যাঁকে গুঁজে তার পাশ থেকে হলদে ফলটা বার করে মুখে পুরল।